স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা
৬৬ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।।
২৮ এপ্রিল - ২০১৪।।
১৪ বৈশাখ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

দুঁদে আইনজীবী, কাছের মানুষ কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতায় জোর লড়াই দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থীরা

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ
যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র

তথাগত রায়
দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র

রাহুল সিন্‌হা
কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

মমতা সিপিএমের নোংরামিকে লুম্পেনদের নষ্টামিতে পরিবর্তন করেছেন গূঢ়পুরুষ ৮

খোলা চিঠি : বিজেপি কাড়ল রাতের ঘুম, সারদা কেড়েছে ভোরের ঘুম সুন্দর মৌলিক ১০

ফুর্তি সরকার এবং আমরা ধীরেন দেবনাথ ১১

চিটফাণ্ডের মতো গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার, স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতি ও শিক্ষার মান দুই-ই কমছে সাধন কুমার পাল ১২

ভোটকথা ১৬-১৮

ধর্মনিরপেক্ষরা আসলে দ্বিচারী, ভীরু ও ভণ্ড মিহিরকুমার সেনগুপ্ত ২০

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন : মৎস্যাবতার ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ২১

উত্তরপ্রদেশ : সপা দিয়েছে ধোঁকা, বসপা দিয়েছে নুনের ছিঁটে মুজফ্‌ফর হোসেন ২৭

ঠাকুরনগর স্থাপনে শ্যামাপ্রসাদ, 'মতুয়া' সম্পদায় গঠনের নেপথ্য ইতিহাস এন সি দে ২৯

কুফরি মতকেই সমর্থন দিলেন দিল্লী-কলকাতার ইমাম? ৩১

প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য ও হিন্দু-দর্শনের চর্চা অমলেশ মিশ্র ৩২

কৈফিয়ত দিতে হবে গান্ধী পরিবারকে কেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের এই দশা করলেন স্বপন দাশগুপ্ত ৩৫

মনমোহনের কোনো বিষদাঁত ছিল না, তাই সোনিয়ার তা উপড়ানোর দরকার হয়নি কাঞ্চন গুপ্ত ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯   নবাঙ্কুর : ২৪-২৫   অঙ্গনা : ২৬

অন্যরকম : ৩৩   সমাবেশ-সমাচার : ৩৯-৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ৩৫-৩৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ২৮ এপ্রিল - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
২৮শে এপ্রিল
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮শে এপ্রিল
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি

দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন চলছে। আর মাত্র দু'টি পর্ব বাকি। এই নির্বাচন পর্ব কেমন চলছে / হলো — এবারের আকর্ষণ এটাই। বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন দেবব্রত চৌধুরী ও এন সি দে।

সংরক্ষণযোগ এই সংখ্যাটির জন্য এখনই কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সারদাকাণ্ড : সত্যকে আড়াল করিবার অপচেষ্টা ?

লোকসভা ভোট চলাকালীন সারদা চিটফান্ডের মালিক বর্তমানে জেলবন্দী সুদীপ্ত সেনের স্ত্রী পিয়ালি ও পুত্র শুভজিতের গ্রেপ্তারের ঘটনা রাজ্য-রাজনীতিতে নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছে। শেষোক্ত দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদের ফলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ই ডি) রাজ্যের শাসক দলের কয়েকজন শীর্ষ নেতার নাম জানিতে পারিয়াছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি-র এই উদ্যোগ, অন্যদিকে পিয়ালি ও শুভজিৎ সেনের রাজ্যের আয়ত্তাধীন হইয়া আর না থাকিতে চাওয়া—এই দুই সাঁড়াশি চাপে উদ্বিগ্ন শাসকদল। উপরন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেও চাহিতেছে ই ডি। ই ডি সূত্রে এমন খবরও পাওয়া গিয়াছে যে, সারদাকর্তাকে নানাভাবে সাহায্য করিবার কাজে যুক্ত বাকি দুইজন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ ও একজন লোকসভার প্রার্থীকে তলব করিতে পারে ই ডি। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনের স্ত্রী পিয়ালি ও ছেলে শুভজিৎকে রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে নাই। পরিবর্তে ওই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লুকাইয়া রাখিতেই বেশি সময় ব্যয় করিয়াছেন রাজ্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। অতীতেও এই রাজ্যে পুলিশ বহু ক্ষেত্রে অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে (যেমন ছোট আঙারিয়া তপন ও সুকুরকে) ব্যর্থ হইয়াছে। যদিও সারদাকাণ্ডে ধৃত দেবযানী মুখোপাধ্যায় জেরায় একাধিকবার দাবি করিয়াছিলেন যে সারদা চিটফান্ডের অর্থের হদিশ দিতে পারিবেন পিয়ালি সেন ও শুভজিৎ সেন। তাই সুদীপ্তর স্ত্রী-পুত্র ধরা পড়িবার পরে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তাঁহাদের খোঁজ পাইলেও পুলিশ পাইল না কেন? ইহা কি পুলিশের ইচ্ছাকৃত?

সারদা চিটফান্ড কাণ্ডে তৃণমূল নেতাদের নাম যুক্ত হওয়ার ঘটনা অবশ্য নূতন নয়। এক বছর আগে গা-ঢাকা দেওয়ার আগে সিবিআই-কে সুদীপ্ত সেন যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে একাধিক তৃণমূল নেতার নাম ছিল। ইহার পর গত নভেম্বরে তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ গ্রেপ্তার হন। আদালত চত্বরে একাধিকবার তিনি সারদার সঙ্গে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্রের সম্পর্ক লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সুদীপ্ত ও কুণাল যে সকল রাজনীতিকের নাম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও সারদা কেলেঙ্কারি লইয়া রাজ্যের তৈরি করা বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই।

২০১৩ সালের ১৫ এপ্রিল প্রথমবার সারদা কেলেঙ্কারির কথা জানাজানি হয়। ইহার পর সারদার একাধিক কর্মী ও আমানতকারী মামলা করিতে থাকেন। কিন্তু গত এক বছরে তদন্তের অগ্রগতি হয় নাই বলিলেই চলে। ই ডি সূত্রের খবর অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সারদা কোম্পানি খোলাবাজার হইতে ২৪৬০ কোটি টাকা তুলিয়াছে। যদিও রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে তৃতীয় দফা হলফনামা দিয়া ১২৮০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আদতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কোথায় যাইল কিংবা কেন আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাইলেন না, সেই প্রশ্নের উত্তরটাই এখন বিশবাঁও জলে। সিট-এর তদন্তের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়াও কিন্তু রাজ্য সরকার যাহাতে সিবিআই-এর হাতে মামলাটি না যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অথচ বিরোধী-নেত্রী হিসাবে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ঘন ঘন সিবিআই তদন্তের দাবি করিতেন। 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'— এই আশঙ্কায় কি রাজ্য সরকারের এই বিপরীত অবস্থান। সত্যকে আড়াল করিবার অপচেষ্টা? স্মরণ রাখিতে হইবে, সত্যকে জানিবার অধিকার মানুষের আছে।

সুভাষিত

অপূজ্যাঃ যত্র পূজ্যন্তে পূজ্যানাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ
ত্রয়স্তত্র প্রবর্ধন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং ভয়ম্।।

অযোগ্য ব্যক্তিদের যেখানে পূজা করা হয় এবং যোগ্য ব্যক্তিদের অসম্মান করা হয়, সেখানে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু এবং ভয়ের পরিবেশ সৃষ্ট হয়।

কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও জলের জন্য গৃহযুদ্ধ দেখা দেবে

বিশেষ প্রতিনিধি॥ সারা পৃথিবী জুড়ে যেভাবে উষ্ণতা বাড়ছে তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা দেবে। উষ্ণায়নের ধাক্কা সামলাতে বিপন্ন হবে জনজীবন। খাদ্য উৎপাদন কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বিশুদ্ধ তাজা পানীয় জলের অভাব। অনেক জায়গাতেই মানুষের বসতি প্রখর তাপের দরুন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। আর ওইরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে খাদ্য পানীয় বাসস্থান নিয়ে রীতিমতো সংঘাত দেখা দেবে সমাজজীবনে। এসব জ্যোতিষীদের ভাগ্যগণনা নয়। সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউ এন ও) ফাঁস হয়ে যাওয়া একটি রিপোর্টে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। পুরোপুরি বাস্তবের কঠিন জমিতে পা রেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন কীরকম ভয়ঙ্কর দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আগাম সতর্কতা সৃষ্টির প্রয়াসও বলা চলে।

প্রকৃতি পাঠ এখন জোরদার ভঙ্গিতে পৃথিবী জুড়ে চলছে। প্রকৃতির রূপ বদল সম্পর্কে যেসব তথ্য মিলছে তার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা আগামী দিনের সম্ভাব্য চিত্র অনুমান করে টোকিও-তে গত ৩১ মার্চ 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জেস্'-এর পঞ্চম পর্যবেক্ষণের প্রকাশিত রিপোর্টে বলেছেন যে উষ্ণায়নের দরুন গৃহযুদ্ধের মতো অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ খাদ্য ও পানীয় জলের সঙ্কটে জনজীবনে চাপ সৃষ্টি হবে। খাদ্য ও পানীয়ের মজুত ভাঁড়ারে টান পড়লে বিশেষত এশিয়ার বিশাল জনতা এক দেশ থেকে (মাস মাইগ্রেসন) অন্য দেশে যেতে বাধ্য হবে। অস্তিত্বের লড়াই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

আমেরিকার কাগজ 'দ্য ইনডিপেনডেন্ট' কয়েকদিন আগে এই অধিবেশন সম্পর্কে একটা খসড়া প্রতিবেদন পেশ করে তুলে ধরেছে সম্ভাব্য সঙ্কটের ভয়াবহ চিত্রটা। 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জেস' নামে এই অধিবেশনে সঙ্কটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞরা যে ছবিটা তুলে ধরছেন তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতি দশকে কৃষি উৎপাদন ২ শতাংশ করে কমছে। অনুমান ২০৫০ সালে খাদ্য উৎপাদন এখনকার থেকে ১৪ শতাংশ কমে যাবে। অন্যদিকে জনসংখ্যার চাপ কিন্তু কমবে না। খাদ্য উৎপাদন ১৪ শতাংশ কমে গেলে ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা হবে কীভাবে? সঙ্কট তীব্র আকার নিলে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে। চারদিকে লুটপাট চলতে থাকবে খাদ্যের জন্যে। খাদ্যের অভাবে বহু মানুষের জীবনে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেবে। অনাহার থেকে আসবে অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য। তা থেকে অসুখ দেখা দিতে বাধ্য।

ভারতের জমিতেও শস্য উৎপাদন কমে যাবে। গম, ধান, বাজরা ও অন্যান্য মরশুমি শস্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেবে। যে ঘাটতির ধাক্কা সামলানোর মতো কোনো মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। শুধু কৃষি নয়, শিল্পক্ষেত্রেও তাপমাত্রা ২.৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে।তার দরুন অর্থনৈতিক উৎপাদনে লোকসান দেখা দেবে। ওইরকম সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য প্রতিবাদের রূপ হবে মারমুখী যা গৃহযুদ্ধের চেহারা নেবে। এইরকম উষ্ণায়নের দরুন তিনটে সঙ্কট তীব্রভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে— জনগণের স্বাস্থ্য-সঙ্কট, বিশুদ্ধ তাজা পানীয় জলের অভাব, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সঙ্কটের সম্ভাব্য ছবি তুলে ধরে হতাশার বাক্য শুনিয়ে দায় সারতে চাননি। তাঁরা এই সঙ্কট থেকে কিছুটা রেহাই যাতে মেলে সেকথাও বলেছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অনেকরকম উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

আবহাওয়া বদল হলে জমি হারাবে তার উর্বরতা, কয়েক লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়বে। অনেক জায়গাতেই সমুদ্র সংলগ্ন এলাকা জলে ডুবে যাবে, সমুদ্রতটের ক্ষয়ও বাড়বে। তাজা জলের অভাব থেকে পরিবেশে বড়রকম বিপর্যয় দেখা দেবে। বিশেষত পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রভাব পড়বে।

সমুদ্রের জলস্তর (Sea level) বাড়ার অর্থ উপকূল সংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে যাবে, বন্যা দেখা দেবে এবং ভাঙন শুরু হবে। খসড়া রিপোর্টে যা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পানীয় জল-সংক্রান্ত ঝুঁকি তাৎপর্যপূর্ণ বাড়বে যা গ্রীণ হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণ হবে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বের খাদ্য ও পানীয় জলের সঙ্কট দুর্ভাবনার যে ছবি তুলে ধরেছেন তাকে এড়িয়ে গেলে বা গুরুত্ব না দিলে মস্ত ভুল হবে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন।।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দীর্ঘ সময় ধরে দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে রাজনৈতিক দলগুলিকে হিন্দিবলয়ের বিশেষত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে। ১৯৬২ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি এই বিহার থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। এযাবৎ নির্বাচিত ১৪ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৮ জনই উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত। এবং এঁরাই স্বাধীনতার পর থেকে সাড়ে ৪৭ বৎসর এদেশ শাসন করেছেন। এবারে এই ২০১৪ লোকসভার নির্বাচনেও বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী, কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মুলায়ম সিং যাদবের মতো ওজনদার রাজনীতিকরা উত্তরপ্রদেশ থেকেই প্রার্থী হয়েছেন।

লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে রয়েছে ৮০টি ও বিহারে ৪০টি। লোকসভার পাঁচ ভাগের বেশি আসন এই দুই রাজ্যের দখলে। ২০০৯ বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ১০টি ও বিহারে ১২টা আসনে জিতেছিল। তাদের স্বপ্নের ২৭২+ লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে যে এই দুই রাজ্যে প্রাপ্ত আসন সংখ্যা অনেকটাই যে বাড়াতে হবে, তা বুঝেই গোড়া থেকেই আটঘাট বেঁধে ছক কষেছিল বিজেপি। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন উত্তরপ্রদেশে ৩৩টি ও বিহারে ২০টি আসনে নির্বাচন হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনারের বিধি মতো এক্সিট পোল এবং জনমত সমীক্ষাও আর করা যাবে না। কিন্তু নির্বাচন শুরুর আগে ২৯ মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিহারে ১৮০০ ও উত্তরপ্রদেশে ৩৬০০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে ইন্ডিয়া টু ডে গ্রুপ এবং সিসিরো (cicero) যে, জনমত-সমীক্ষা প্রকাশ করেছে তাতে হিন্দি বলয়ে বিজেপি ঝড় বইবে। বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ৪৬ ও বিহারে শরিক দল সহ ২২। কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে ৮ ও শরিকদল সহ বিহারে ১৭টি আসন পাবে। অন্যদিকে এনডিটিভি-র সাম্প্রতিক (১৫.৪.১৪-তে প্রকাশিত) এক সমীক্ষায় ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ ২৭৫টি আসন পাবে বলে জানানো হয়েছে যা ম্যাজিক সংখ্যা (২৭২) থেকে ৩টি বেশি। বিজেপি একাই পাবে ২২৬টি আসন। ইউপিএ সরকারের কাজকর্মের প্রতি মানুষের ক্ষোভ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় নরেন্দ্র মোদীর গ্রহণযোগ্যতা বিজেপিকে জয়ের পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশে ৮৫টির মধ্যে ৮৩ এবং অবিভক্ত বিহারে ৫৪টির মধ্যে ৪৮টি আসন কংগ্রেস পেয়েছিল। এই সমীক্ষার মতে বিজেপি এই দুই রাজ্যের ২০১৪-র নির্বাচনে আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। আঞ্চলিক দলগুলি, যেমন উত্তরপ্রদেশে বিএসপি ৯ থেকে ১৩ এবং সমাজবাদী পার্টি ১৫ থেকে ২১টা আসন পেতে পারে।

টি-ট্যুরিজমের নামে চা-বাগানের জমিতে রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা

বাসুদেব পাল : শিলিগুড়ি ॥ গত দুই দশক ধরে উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প সঙ্কটগ্রস্ত। আরও সত্যি করে বললে চা-শিল্পে চলছে একপ্রকার মনুষ্য-সৃষ্ট মন্দা। যার নির্মম বলি হয়ে চলেছেন অসংখ্য বনবাসী চা-শ্রমিক, আর যাদের পরিণতি অকাল অনাহার মৃত্যুতে। ইতিমধ্যে অবশ্য কেন্দ্রের নেতা, মন্ত্রী ও সংবাদমাধ্যমের অতি উৎসাহী প্রচারে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ রকম একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে বর্তমান চা-শিল্পের এই সঙ্কটের জন্য দায়ী বাজারে চা-পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া। তার উপর উত্তরোত্তর চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি। এক কথায়, উৎপাদন আর কম চাহিদার দরুন লভ্যাংশ হ্রাস নাকি এই সঙ্কটের জন্য দায়ী। চা-শিল্পের তথ্য-পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে।

আমাদের দেশে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা (প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩.৩ হারে) এবং রপ্তানির সমন্বিত প্রয়োজন উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি। এক হিসাব অনুযায়ী ২০০৬ সালে আমাদের দেশে চা-এর অভ্যন্তরীণ চাহিদা ছিল ১০১০ মিলিয়ন কেজি। আর উৎপাদন এবং আমদানি সম্মিলিত ভাবে ছিল ৯৮০ মিলিয়ন কেজি। অর্থাৎ ঘাটতি ছিল ৩০ মিলিয়ন কেজি। ফলত চায়ের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু কেন চা-শিল্পে এমন সাজানো মন্দা-মন্দা খেলা? আসলে চা-শিল্পপতি, সরকার উভয়ের লক্ষ্য হলো চা-বাগানের বিপুল জমি। যেন-তেন-প্রকারেণ একবার মন্দার দোহাই দিয়ে কোনও চা-বাগান বন্ধ করাতে পারলেই কেল্লা ফতে। তার পর বন্ধ চা-বাগানের জমিতে চলবে রিয়াল এস্টেটের ফাটকা ব্যবসা কিংবা হাল আমলের টি-ট্যুরিজম। কিন্তু আইন মোতাবেক চা-বাগানের জমি অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না। তাহলে আইনের কী হবে? ২০০৭-এ রাজ্য পর্যটন দপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে আইন পাল্টে দ্রুত চা-শিল্পের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। সেই মর্মে ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্য টি-ট্যুরিজম চালু করার জন্য কেন্দ্রের অনুমোদন চায়। প্রায় মেঘ না চাইতে বর্ষণের মতো কেন্দ্র শুধু আবেদন মঞ্জুরই নয়, ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে। অতএব এবার বিকৃত লালসা ও পচাগলা ভোগবাদী সংস্কৃতির অন্যতম বাহন টি-ট্যুরিজমে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। প্রচুর মুনাফা। 'ওয়ানটাইম ইনভেস্ট, ফুল টাইম প্রফিট।' এসব নাকি বাগানের স্বার্থে, শ্রমিকের স্বার্থে, সর্বোপরি দেশের স্বার্থে। চালচিত্র বলছে দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজির সহযোগিতায় গড়ে ওঠা টি-ট্যুরিজম সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। —ধনী শ্রেণীর জন্য। এতে চা-শিল্পের সংকট, চা-শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যু ঠেকানো অসম্ভব।

মমতা সিপিএমের নোংরামিকে লুম্পেনদের নষ্টামিতে পরিবর্তন করেছেন

আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিটি দলীয় নির্বাচনী সভায় বিজেপি প্রার্থীদের চরিত্রহনন করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন। ধমকাচ্ছেন। নির্বাচনের 'মডেল কোড অফ কনডাক্ট' মানছেন না। কটু কথা বলার কোনও সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হতেন। একবার স্মরণ করুন, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি কীভাবে 'বিলো দ্য বেল্ট' আঘাত করেছেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। জয়ের অতি স্বচ্ছল পরিবারের ঘর খরচা নাকি তিনিই দেন। চব্বিশ ঘণ্টা মিথ্যা কথা বলার প্রতিযোগিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান খেতাব দেওয়া উচিত। যেটা সকলেরই অরুচিকর বলে মনে হয় তা হলো একজন মহিলা নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তাঁর দলীয় নির্বাচনী সভায় মঞ্চে ঘুরে ঘুরে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথা বলেন, তাতে মনে হয় তিনি বস্তির কলতলায় জলের লাইনের দখল নিয়ে ঝগড়া করছেন। নির্বাচনে দলীয় আদর্শ ও নীতির লড়াই হয়। ব্যক্তি লড়াই নয়। এসব কথা মুখ্যমন্ত্রীকে বলে লাভ নেই। কারণ তাঁর দল একেবারেই ব্যক্তি-নির্ভর দল। তাই তিনিও ব্যক্তি-আক্রমণে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে মমতার একেবারেই আস্থা নেই। তাঁর দলেও গণতন্ত্র নেই। তিনিই দলের সর্বেসর্বা। তবে গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ফেরাতে পারেন রাজ্যের সচেতন ভোটদাতারা। ভোটে তৃণমূলের প্রার্থীদের প্রত্যাখান করে তাঁরাই পারেন নেত্রীকে গণতন্ত্রের রীতিনীতি বোঝাতে যে নির্বাচনী লড়াই আর কলতলার জলের লাইন দখলের লড়াই এক নয়।

ব্যক্তি আক্রমণ, বিরোধী দলের প্রার্থীদের চরিত্র হনন, প্রথম শুরু করে বামপন্থীরাই। বিশেষ করে সিপিএম। তারাই প্রথম দেওয়াল জুড়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে নোংরা শ্লোগান লিখতে শুরু করে। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। প্রদেশ কংগ্রেস

গূঢ়পুরুষের

কলম

সভাপতি ছিলেন প্রয়াত অতুল্য ঘোষ। অতুল্যবাবুর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না। কম্যুনিস্টরা তাঁকে 'কানা অতুল্য' বলে ব্যঙ্গ করতেন। ছয়ের দশকের মধ্যভাগে বাংলার কম্যুনিস্টরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখলেন, 'দু' আনা সের বেগুন কিনে মন হলো প্রফুল্ল/ বাড়িতে এসে কেটে দেখি সবই কানা অতুল্য।' প্রফুল্ল সেনের চরিত্র হননে কম্যুনিস্টরা প্রচার করেছিল যে তিনি নাকি কলকাতার অফিস পাড়া ডালহৌসি স্কোয়ারের স্টিফেন হাউসের বেনামা মালিক। কম্যুনিস্টরা দাবি করতো যে বাংলা কংগ্রেস নেতা প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বেনামে ব্যাঙ্কে বিপুল অর্থ আমানত করেছেন। আর এই রটনায় ইন্ধন যোগাতেন জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত মশাই। অথচ এই দুই অবিবাহিত বৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতা পথের ভিখারির মতো নিঃসম্বল অবস্থায় মারা যান। জ্যোতিবাবুরা তখন রাজার হালে বাংলার মসনদে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। এই কম্যুনিস্টরাই শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে ছয়ের দশকে দেওয়ালে লিখেছে 'আভাদিদির মাইলো/ সবাই মিলি খাইলো।' এর কারণ, তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী আভা মাইতি খরা ক্লিষ্ট মেদিনীপুরে গমের মাইলো বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। ১৯৭২ সালে কলকাতার বরানগরে বিধানসভার নির্বাচনে সিপিআই প্রার্থীর কাছে জ্যোতিবাবু গোহারান হারার পর রুশপন্থীরা দেওয়ালে জ্যোতিবাবুর কার্টুন সহ শ্লোগান লিখেছিল, 'শুয়োরের বাচ্চা জনগণ/ রইল তোদের নির্বাচন / আমি চললাম বৃন্দাবন'। হ্যাঁ, বাংলার রাজনীতিতে নোংরামির জনক বাঙালি কম্যুনিস্টরা। মমতা সেই নোংরামিকে এখন লুম্পেনদের নষ্টামিতে পরিবর্তন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে লুম্পেন রাজনীতিরও জনক সিপিএম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের লুম্পেনদেরই আজ ব্যবহার করছেন তাদের জনকের বিরুদ্ধে।

বিজেপি-র বিরুদ্ধে নীতিহীন শ্লোগান বা সমালোচনা করার একটিও অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা দেশেও খুঁজে পাবেন না। ১৯৯৬ সালে লোকসভার নির্বাচনে অটলবিহারী বাজপেয়ী লখনউতে প্রার্থী হন। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়, 'বারি বারি সবকি বারি / অবকি বারি অটলবিহারী।' অর্থাৎ অন্য সবাইকে দেখা হয়েছে, এখন আমরা বাজপেয়ীজীকে দেখতে চাই। এবার ২০১৪ সালে বিজেপি-র সুপার ডুপার হিট শ্লোগান, 'নমো'। নমো মানে নরেন্দ্র মোদী। মাত্র দুটি শব্দ ব্যবহার করে কতটা জোরালো বক্তব্য রাখা যায় তার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ সারা দেশ ঢুঁড়েও খুঁজে পাবেন না। কোথাও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে একটিও তির্যক কথা নেই। চরিত্র হননতো অনেক বড় ব্যাপার। একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রথম দফার নির্বাচন হওয়ার পরেই তৃণমূল নেত্রী দলীয় সভামঞ্চে অনেক নাচন কোঁদন করে বেছে বেছে বিজেপি প্রার্থীদেরই চরিত্র হননের কৌশল নিয়েছেন। কারণ, এবার বিজেপি-র পক্ষে চোরা স্রোত। এতটা সমর্থন বিজেপি প্রার্থীরা পাবেন কল্পনাও করতে পারেননি।

নেত্রী ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ডাক দিয়েছিলেন, ‘চুপচাপ ফুলে ছাপ’। তাঁর সেই কথাটাই ভোটদাতারা এবার ফেরত দিয়েছেন, ‘চুপচাপ কমলে ছাপ’ দিয়ে। এতেই নেত্রীর মাথাটা গরম হয়েছে। তিনি চতুর্দিকে চক্রান্ত দেখছেন। মালদার বড় হোটেলের ঘরে তাঁকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে চক্রান্ত হয়েছিল। অথচ আসল সত্যটি হচ্ছে, নেত্রী হোটেলের ঘরে আসার আগে টানা তিনদিন দিবারাত্র এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রটি চালিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। কেন? যন্ত্রেরও চলার বিরামের প্রয়োজন হয়। মমতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কি উচিত ছিল না জানার কেন তাঁর আগমনের তিনদিন আগে থেকে ঠাণ্ডাই যন্ত্রটি অবিরাম চলার নির্দেশ দেওয়া হয় হোটেল কর্তৃপক্ষকে। মমতা বা তাঁর দলের সাঙ্গোপাঙ্গোরা নিজেদের গাফিলতি ঢাকতেই উল্টে সব দোষ নির্বাচন কমিশনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রচার করছেন, কমিশন মুখ্যমন্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। গণ্ডমূর্খদের জানা উচিত যে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল মালদা জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের। নির্বাচন কমিশন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা জোরদার করার। তবে এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন হঠাৎ বিকল হলেও প্রাণ সংশয় হয় না। স্পিল্ট্ এসির মূল যন্ত্রটি ঘরের বাইরে থাকে। অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক্ করলে তা সাধারণভাবে ঘরের বাইরেই ছড়াবে। পাইপের মাধ্যমে তার কিছুটা ঘরের ভিতরে ঢুকলেও প্রাণহানি হয় না। বড় জোর চোখ জ্বালা করতে পারে। কিন্তু তাঁকে খুনের চক্রান্ত করা হয়েছিল প্রচার করে নেত্রী মানুষের সহানুভূতি কুড়োতে চেয়েছিলেন। আশার কথা যে, মানুষ নেত্রীর চক্রান্তটা বুঝেছেন।

আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়কে তৃণমূল নেত্রী অস্ত্র আইনে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা এতটাই হাস্যকর ও লজ্জাজনক যে সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত। আসানসোলে নেত্রীর দলের ‘সেনাপতি’ মশাই প্রথমে বললেন, বাবুল সুপ্রিয় মদ্যপান করে মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত করার জন্য বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হোক। নির্বাচন কমিশন লিখিতভাবে জানিয়ে দিল এই অভিযোগ মিথ্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরপরেই অভিযোগ, বাবুল সুপ্রিয় নাকি পিস্তল পকেটে গুঁজে প্রচারে বেরোচ্ছেন। হাজার দফায় জেরা করে, সার্চ করে, পুলিশ একটি বলপয়েন্ট পেন ছাড়া তাঁর কাছ থেকে কিছু পায়নি। তবুও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র রাখার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। বাবুল সুপ্রিয় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পাল্টা দু’ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের মানহানির মামলা দায়ের করেছেন। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বাপ্পী লাহিড়ীকে দু’বেলা অকথ্য গালাগালি দিচ্ছেন সেখানের তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর ভয় ধরেছে যে এবার বিজেপি-র চোরা স্রোতে তিনি হড়কাতে পারেন। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন আমার নিজস্ব সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ারে বিজেপি প্রার্থী জিতছেন। দক্ষিণবঙ্গে জয়ের আশা আছে আসানসোল, বীরভূম, শ্রীরামপুর এবং উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে। অর্থাৎ রাজ্যে কমপক্ষে ছয়টি লোকসভা আসনে বিজেপি-র পাল্লা ভারী। তৃণমূল কংগ্রেস ২০০৯ সালে জেতা ১৯টি আসন সম্ভবত ধরে রাখতে পারবে না। যদি তা হয় তবে সেটা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের সোনা চুরির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতকে বিদেশীরা যে ‘সোনে কা চিড়িয়া’ বা সোনার পাখি বলে ডাকে তা যে অহেতুক নয়, আমাদের দেশে মঠ- মন্দিরগুলিই তার প্রমাণ। তিন বছর আগে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরে যে সোনার সন্ধান পাওয়া গেছিল তার অর্থমূল্য ১ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে এক হিসাবে অনুমান।

সম্প্রতি কেরলে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত আধিকারিক গোপাল সুব্রহ্মনিয়াম ৩৫ দিন ধরে মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্যবেক্ষণের পর সুপ্রিম কোর্টে প্রদত্ত রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, মন্দিরের কিছু আসল সোনা ও অলঙ্কার সরিয়ে ফেলা এবং বদলে কিছু নকল অলংকার সেখানে বসানো হতে পারে। কেননা সেখানে একটা সোনা কাটা মেশিন (Gold Plating Machine) পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ যাবৎ পাঁচটি ভল্ট (vaults) —এ সি ডি ই এফ— খোলা হয়েছে এবং প্রাপ্ত সামগ্রীগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শুধু বি ভল্টটি ধর্মীয় ও মন্দিরের নিয়ম-কানুনের কারণে খোলা হয়নি। ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবার এ মন্দিরে ট্রাস্টি। সুব্রহ্মমনিয়ামের প্রস্তাব— প্রাক্তন কমপ্রোটলার (comptroler) অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাম্প) বিনোদ রাই-কে দিয়ে বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত করানো হোক।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বিজেপি কেড়েছে রাতের ঘুম, সারদা কাড়ল ভোরের ঘুম

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

সত্যি দিদি আপনার কথা ভেবে কষ্ট হয়। এক সঙ্গে সবাই মিলে চক্রান্ত করছে আর অন্যদিকে আপনি একা। সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে! আপনি নিজেই নিজেকে বড় একলা করে দিয়েছেন। উল্টে এখন সারদার প্রতীক হিসেবে আপনার যা অবস্থা তাতে আপনার হাত ধরতেই সবাই ভয় পাচ্ছে। কংগ্রেস ভেঙে নতুন দল গড়ার পর আপনি যে কংগ্রেসের মোকাবিলা করতে পারেন তা এতদিনে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সিপিএম তথা বামেদের মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তাদেরই দেখানো পথে তাদের কাৎ করাতেও যে আপনি পারদর্শী তাও প্রমাণিত। কিন্তু এখন রাজ্যে একা বিজেপি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ভোরের দিকে যেটুকু ঘুম হচ্ছিল তাও কেড়ে নিল সারদা।

দিদি, সত্যি আপনি শান্তি পেলেন না। আপনার প্রিয় আরাবুল, মনিরুলরা তো আপনাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। অনুব্রতরা আদালতে ঘোরাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ যুদ্ধ ফোঁস করে শেষে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু এত করেও বিজেপি যে আপনার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রমে জল ঢেলে দিতে চাইছে তা আপনি টের পাচ্ছেন ভালোই। আমি কিন্তু অতটা বুঝতে পারিনি। বুঝিয়ে দিলেন আপনিই। যবে থেকে ফুল ফর্মে প্রচারে নেমেছেন তবে থেকে বিজেপি-কে গাল দেওয়াটা অনেকটা সেই সব পুজো করার আগে গণেশ ঠাকুরকে ফুল দেওয়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি হয়তো চাঁদ সদাগরের মতো বাঁ হাতে ফুল দিচ্ছেন কিন্তু সেটাই সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কতটা ভয় পেয়েছেন আপনি।

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে যে আর কোনও যদি নেই তা বুঝে গেছে গোটা দেশ। আর বাংলার মানুষের যেটুকু বোঝা বাকি ছিল তা আপনি একাই দায়িত্ব নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দার্জিলিং দিয়ে শুরু হয়েছে আপনার গালপর্ব। এরপর আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে গিয়ে বিজেপি, বিজেপি, বিজেপি করেই আপনার বক্তৃতার বড় অংশ কেটে গেছে। এরপর যেখানে যেখানে বিজেপি-র শক্তি বেশি বুঝেছেন সেখানে বোনাস হিসেবে বাড়তি বিজেপি পুজো চলছে আপনার বক্তৃতায়। আমি হিসেব করে দেখেছি, বালুরঘাটে, কৃষ্ণনগরে, বীরভূম, আসানসোলে আপনার বক্তৃতার প্রায় ৭০ শতাংশ জুড়ে আছে বিজেপি-কে গালাগাল। বাকি ২০ শতাংশ কংগ্রেস, সিপিএমের জন্য বরাদ্দ। বাকি ১০ শতাংশ রাজ্যে হ্যান করেছি, ত্যান করেছি ফিরিস্তি। যদিও দিদি আপনার ওই রাজ্যে এটা সেটা করার ফিরিস্তি কেউ শুনতে চাইছে না। কারণ অনেকগুলো। প্রথমত এই সব কথা বারবার শুনে মানুষের কান পচে গেছে। দ্বিতীয়ত সেসব কাজ যে আসলে লবডঙ্কা হয়েছে তা রাজ্যবাসীর কাছে নতুন কোনও কথা নয়। তৃতীয়ত এটা লোকসভা নির্বাচন। তাই রাজ্যের কথা না শুনে মানুষ জানতে চায় আপনার প্রধানমন্ত্রীত্বে স্বপ্নের সরকার দেশে কী করবে।

এই প্রসঙ্গে দিদি আপনাকে আরও একটা কথা বলতেই হয়। আপনি মূলত বিজেপি সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আনছেন তার অন্যতম বিজেপি হিন্দু মুসলমান বিভেদ ঘটিয়ে দেশকে ভাঙতে চাইছেন। কিন্তু দিদি এই দেশে ধর্মের ভিত্তিতে সব থেকে বড় ভাগ অর্থাৎ দেশভাগের সময় কোথায় ছিল বিজেপি? কোথায় ছিলেন নরেন্দ্র মোদী?

আপনার আর একটা বড় অভিযোগ নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি নাকি গুজরাত মডেল বলে যা প্রচার করছে তার সবটাই বানানো। এটা হতেই পারে। বিজেপি-র এই প্রচার তো গোটা দেশে। তবে গুজরাটের মানুষ এই মিথ্যা প্রচার মেনে নিচ্ছেন কেন? বারবার মোদির নেতৃত্বে বিজেপিকে জেতাচ্ছেই বা কেন গুজরাটের মানুষ?

দিদি, কয়েকটা কেন্দ্রের নাম আমি বলেছি যেখানে বিজেপি আপনার দলের অভ্যন্তরীণ হিসেবেই জিতে গেছে। কিন্তু বাকি আরও অনেক কেন্দ্রেই বিজেপি না জিততে পারলেও আপনার দলকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বানিয়ে দেবে। আর অনেক কেন্দ্রেই আপনাদের ভাবনাকে হারিয়ে দিয়ে জনগণ বিজেপি-কে জেতানোর হিসেব করে ফেলেছে। তাই দিদি আপনাকে পরামর্শ— শুধু আসানসোলের বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করলেই হবে না, বাপ্পি লাহিড়ি, ডঃ সুভাষ সরকার, রাহুল সিনহা, তপন সিকদারের বিরুদ্ধেও মামলা খুঁজুন।

না, দিদি এখন আর চিঠি লম্বা করে আপনার ভয় বাড়াবো না। এই সময় সারদাকাণ্ডের তদন্তও যেদিকে যাচ্ছে তাতে সত্যিই আপনার ভোরের ঘুমটাও নেই। আমারও ভয় করছে। যেভাবে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর কান ধরে টানাটানি করছে তাতে মাথাও না ফেঁসে যায়। সেসব ভেবে আমার ভয় করছে। তবে দিদি মনে রাখবেন সুদীপ্ত সেনকে প্রায় দুকোটি টাকায় ছবি কেনানোর মামলায় আপনাকে ফাঁসানো যাবে না। একজন শিল্পীর ছবির দাম কত হবে তা নির্ভর করে শিল্পী এবং শিল্প দরদী ক্রেতার রুচির ওপর।

—সুন্দর মৌলিক

ফুর্তি সরকার এবং আমরা

ধীরেন দেবনাথ

পশ্চিমবঙ্গ যখন অনুন্নয়ন, মূল্যবৃদ্ধি, নিরাপত্তাহীনতা, নারী পাচার, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনোখুনি, তোলাবাজি, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, বেকারত্ব, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, স্বজনপোষণ ও অশান্তির এক নরককুণ্ডে পরিণত হচ্ছে তখন ফুর্তি সরকার নাচা-গানা, মেলা- মোচ্ছব, ফিস্টি-জলসা, শিলান্যাস, পুরস্কার প্রদান, দান-খয়রাত এবং রঙ্গমঞ্চে নাচের তালে দলীয় কুশীলবদের তাল মেলানোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সরকারি কোষাগারের টাকা তথা জনগণের দেওয়া ট্যাকসের টাকা দেদার খরচ করে। ফুর্তি সরকারের বড়বাবু ঘোষণা করেই দিয়েছেন— গত আড়াই বছরে তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ৯৯ শতাংশই তিনি পালন করেছেন। অথচ এ রাজ্যের অভাজনরা দেখতে পাচ্ছি না, নতুন কোনো কল-কারখানার

চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়তে। বরং দেখছি, যেগুলি দিয়ে ধোঁয়া উড়ত সেগুলির ধোঁয়াও ক্রমে অদৃশ্য হচ্ছে। আর আইন-শৃঙ্খলা, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ? যত কম বলা যায় ততই ভালো। সারা দেশে এসবে এ রাজ্যের স্থান প্রায় শীর্ষে। প্রতিদিনই সংবাদপত্রে গণ্ডাগণ্ডা নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। লজ্জায় কাটা যাচ্ছে মাথা। এছাড়াও খবর হচ্ছে, খুনোখুনি, রাহাজানি, তোলাবাজি, চুরি, ডাকাতি, নারী পাচার, গোরুপাচার নিয়েও। অথচ বড়বাবু তথা স্বরাষ্ট্রবাবু নির্বিকার। আজ নিরাপত্তাহীনতায়ও ভুগছে অনেকেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে কিনা তা নিয়ে রয়েছে তাদের সন্দেহ। আবার শিক্ষাঙ্গনে চলছে শাসকদলের গুণ্ডামি, মারামারি ও রক্তপাত। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে শাসকদলের পক্ষে একতরফা। আর হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার আছে তো চিকিৎসা নেই, ওষুধ নেই; ওষুধ আছে তো ডাক্তার নেই। তাই গরিব রোগীদের ভোগান্তিরও শেষ নেই।

ফুর্তি সরকারের বড়বাবু তাঁর সাধের 'নবান্ন'-এ সাংবাদিকদের অযথা প্রবেশ বা ঘোরাঘুরি বন্ধ করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কোনো সাংবাদিকের বেয়াড়া প্রশ্নে তিনি যৎপরোনাস্তি কুপিত হচ্ছেন। মিডিয়ার দোষারোপ করছেন। উল্টে বলছেন, সব ঠিক আছে, ভালো চলছে। বেসুরো শুনলে বলছেন, মিথ্যে কথা, সব বিরোধীদের অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র। অবশ্য এতসবের পরেও তিনি শোনাতে ভুলছেন না— 'ভাঁড়ে মা ভবানী'র খবর। আর্থিক টানাটানির কথা শুনিয়ে বলছেন, দিল্লী দিচ্ছে না। রাজ্য লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের জালে জর্জরিত। মেটাতে হচ্ছে সুদের টাকা ইত্যাদি। অথচ ফুর্তি, মোচ্ছব, দান-খয়রাত, পুরস্কার বিতরণ, ক্ষতিপূরণে টাকার অভাব হচ্ছে না। কেবল উন্নয়নকালে টাকায় টান পড়ছে। ভড়ংবাজি আর কি? তাছাড়া 'গৌরী সেন'রাও যে আছে! আর ফুর্তি সরকারের কীর্তিমান পুলিশ তো ধরে আনতে বললে বেঁধে আনছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ— এসব নাকি এ রাজ্যে নগণ্য ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা (Petty matter)। সরকারের 'সেবাদাস' পুলিশ আবার ওসব ঘটনাকে মারপিটের ঘটনা বলে দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া পার্টির 'কেষ্টা'রা আইনকে হাতে নিতে বললেও তাতে দোষ নেই।

সত্যি বলতে কী, বাম সরকারের পরিবর্তে এসেছে ফুর্তি সরকার। এটাই যা 'পরিবর্তন'। বাম রাজত্বে যা যা ঘটেছে, এ রাজত্বেও তাই তাই ঘটছে। পার্থক্য এটাই, এদের দৃষ্টিতে ওদেরটা ছিল ভুল, অপসংস্কৃতি ও জনবিরোধী। অর্থাৎ 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। কিন্তু ওদেরটা যখন এরা করছে তখন সব ঠিক, সুসংস্কৃতি ও জনস্বার্থবাহী। আজ এই 'সব পেয়েছির রাজ্যে' বড়, মেজো, সেজো, ছোট সববাবুর সঙ্গে আমলা, কর্মচারি, মোসাহেব, পুলিশ, বাজনদার, দেবদেবী, 'গৌরী সেন' সবাই একসুরে গাইছে--- ফুর্তি সরকারের জয়গান— "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে...।" ফুর্তি সরকার আর যাই হোক এক শ্রেণীর মানুষের মনে চালাকি, ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার মাধ্যমে নেশা-রঙ ধরিয়ে দিতে পেরেছে। তাই তারা নাচছে উদ্বাহু হয়ে। দিচ্ছে ফুর্তি সরকারের জয়ধ্বনি। সাবাস, ফুর্তি সরকার! সাবাস, বড়বাবু! সাবাস!! আমরা মানে অফুর্তিবাজরা আপনার ফাঁকিবাজির তারিফ না করে পারছি না। আমরা দুঃখিত বড়বাবু!

চিটফান্ডের মতো গজিয়ে উঠছে কোচিং সেন্টার

স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতি ও শিক্ষার মান দুই-ই কমেছে

সাধন কুমার পাল

সংখ্যাতত্ত্বে এগোলেও গুণবত্তার বিচারে দেশের শিক্ষাক্ষেত্র সেই পিছিয়েই। রিপোর্ট বলছে ২০০৮-এ শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় যেখানে ৬৮,৫০০ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে তা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৭ হাজার কোটি টাকায়। এতে ৯৬ শতাংশ ছেলেমেয়েকে শিক্ষাঙ্গনে টেনে এনে সংখ্যাতত্ত্বকে ঊর্ধ্বমুখী করা সম্ভব হলেও গুণাত্মক বিচারে শিক্ষার মান ক্রমশই নিম্নমুখী। ২০০৯-এ শিক্ষার অধিকার আইন পাশ করেও শিক্ষার মানের এই নিম্নমুখী পতন আটকানো যাচ্ছে না। স্বেচ্ছাসেবী গবেষণা সংস্থা 'প্রথম'-এর বার্ষিক রিপোর্ট বলছে গত পাঁচ বছরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনেকটাই ভালো হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০০৯-এ যেখানে পঞ্চম শ্রেণীর ৫২.৮ শতাংশ পড়ুয়ার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর বই থেকে স্বচ্ছন্দে রিডিং পড়ার মতো প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ছিল ২০১৩-তে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৭ শতাংশে। ২০১০-এ তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত (প্রায় ৮ বছর বয়সের) সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে ৩৩.২ শতাংশের মধ্যে দুই অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগ করার মতো প্রাথমিক জ্ঞানটুকু ছিল ২০১৩-তে তা নেমে গেছে ১৮.৯ শতাংশে।

পরিকাঠামো উন্নয়নে দেদার বরাদ্দের ফলে স্কুলগুলির বাহ্যিক পরিবর্তন চোখে পরার মতো। পরিসংখ্যান বলছে পানীয়জল, শৌচাগার, শ্রেণীকক্ষ, সীমানা প্রাচীর ও মিড-ডে মিলের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির অভাব না থাকা সত্ত্বেও পড়ুয়ারা ক্রমশই স্কুলের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে যেখানে ৬৬ শতাংশ পড়ুয়াকে শ্রেণীতে পাওয়া যেত ২০১৩-তে সেখানে ৫৯ শতাংশ পড়ুয়াকেও স্কুলে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

রিপোর্টে বেসরকারি স্কুলগুলির চেয়ে সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষার মানের এই ধারাবাহিক ক্রমাবনতি যে বেশি এটাও ধরা পড়েছে। বলা হয়েছে সরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ৩৭ শতাংশ পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পড়ার মতো ছোট্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেও বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ। ২০০৫-এ গ্রামীণ ভারতে যেখানে ১৭ শতাংশ, ২০০৬-এ ১৮.৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়তো ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ শতাংশে। পরিসংখ্যান থেকে এটাও স্পষ্ট শিক্ষার মানের পার্থক্যের জন্যই অভিভাবক/ অভিভাবিকারা শিক্ষার সরকারি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ক্রমশই ঝুঁকছেন শিক্ষার বেসরকারি ব্যবস্থার দিকে।

> **যে কারণে অর্থাৎ অতিলাভ বা অতিলোভ কিংবা বিনাপরিশ্রমে অর্থবান হওয়ার লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চিটফান্ডের পেছনে ছোটে, ঠিক একই কারণে পেছনের দরজা দিয়ে কিছু না শিখেই ডিগ্রি লাভের আশায় মানুষ এই সমস্ত কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরদের দ্বারস্থ হচ্ছে।**

প্রশ্ন হচ্ছে, একদিকে শিক্ষার অধিকার আইন করে বরাদ্দ বাড়িয়ে পরিকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শেখানোর উপকরণ, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, মিডডে মিল থেকে শুরু করে পুস্তক কেনা বা পোশাকের জন্য নগদ দিয়েও শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় অভাব মেটানোর চেষ্টা হলেও যাদের জন্য এতকিছু সেই আমজনতার মধ্যেই শিক্ষার সরকারী ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কেন? কেনই বা শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাচ্ছে না?

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা সভা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বিশেষজ্ঞদের মতামতে চোখ রাখলে দেখা যাবে, শিক্ষকদের পড়ানোয় অনাগ্রহ, নিয়মিত ও সময় মতো বিদ্যালয়ে না আসা, পাঠদানকে আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে যে সমস্ত কৌশল ও উপকরণ শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেগুলিকে শ্রেণীতে ঠিকঠাক প্রয়োগ না করা, পড়ুয়ারা শিখলো কি শিখলো না সে দিকে নজর না দিয়ে দায়সারাভাবে সিলেবাস শেষ করার প্রথা, শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষকরা যা শিখলো সেগুলি শ্রেণীতে প্রয়োগ

না করার মতো কারণের মধ্যেই যেন নিহিত রয়েছে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর।

সন্দেহ নেই শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের মানসিকতাকেন্দ্রিক এই সমস্ত সমস্যা আশানুরূপ ফল না ফলার একমাত্র মাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করলে বিষয়টিকে বোধহয় অতিসরলীকরণ করা হয়ে যাবে। কারণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিকাঠামোগত সমস্যা নেই, উপরে উল্লেখিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিকতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নেই একথা বোধহয় কেউ বললেন না। তবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে একটি বাড়তি পেশাগত চাপ থাকে। কারণ কাজে সন্তোষজনক তৎপরতা না থাকলে মানুষ যেমন ওই প্রতিষ্ঠানমুখী হবে না তেমনি নিজের চাকুরিও বাঁচবে না। বাহ্যিক ঠাটবাটের বিচার বাদ দিলে বেসরকারি স্কুল মানেই সরকারি স্কুলের চেয়ে ভালো পড়াশোনা হয় এমনটা নাও হতে পারে। তবুও বর্তমানে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও বিশ্বাস শিক্ষার বেসরকারি উদ্যোগের দিকেই।

এই প্রবণতার জন্যই এখন কোচিং সেন্টার প্রাইভেট টিউশনের হাতধরে একটি সমান্তরাল ছায়া শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যত দিন যাচ্ছে এই ছায়া শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। একথার বড় প্রমাণ হল, পুস্তক ব্যবসায়ীরা নিজেদের বইয়ের প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে নমুনা কপি বিলির ব্যাপারে প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টারগুলিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ক্লাব বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আয়োজিত কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় জোটানোর জন্য স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারগুলির উপর নির্ভর করছে বেশি। মানুষের এই প্রবণতা সম্পর্কে সরকারের নীতিনির্ধারকরাও সচেতন। না হলে একদিকে সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ঢালাও অনুমোদন দিয়ে পরোক্ষভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিক্ষা বিক্রির প্রক্রিয়ায় উৎসাহ যোগাবে কেন?

শুধুমাত্র শিক্ষার সরকারি ধারার দুর্বলতার হাত ধরেই বেসরকারি ধারাটি পত্রে-পুষ্পে ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে এমনটা বলাও বোধহয় ঠিক হবে না। পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া, ভাঙচুর বা পথ অবরোধের ঘটনা ঘটে সেগুলিতে গিয়ে খোঁজ করলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত বিক্ষোভের মূল উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের পড়ানোর দায়িত্বে থাকা কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটররা। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত কোচিং সেন্টারগুলিতে ১০০ পার্সেন্ট কমন সাজেশনের লোভ বা বিনাপরিশ্রমে শর্টকাট পথে পাশ করিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বিশুদ্ধ বাণিজিক কারণেই পড়ুয়াদের টেনে আনা হয়। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে নিজেদের সাফল্যের হার টিকিয়ে রাখার জন্য এই সমস্ত কোচিং সেন্টার পড়ুয়াদের পরীক্ষাকেন্দ্রে সমস্ত রকম অসদুপায় অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

যে কারণে অর্থাৎ অতিলাভ বা অতিলোভ কিংবা বিনাপরিশ্রমে অর্থবান হওয়ার লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চিটফান্ডের পেছনে ছোটে, ঠিক একই কারণে পেছনের দরজা দিয়ে কিছু না শিখেই ডিগ্রি লাভের আশায় মানুষ এই সমস্ত কোচিং সেন্টার বা প্রাইভেট টিউটরদের দ্বারস্থ হচ্ছে। এমনও দেখা যায় স্কুলের সময়ে অপেক্ষাকৃত কম রেটের অফারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ুয়ারা স্কুলের সময়ে স্কুলে না গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে কোচিং সেন্টারে বা প্রাইভেট টিউটরের 'টোলে'। স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমে যাওয়ার এটিও একটি অন্যতম বড় কারণ। কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটর মানেই যে শিক্ষা ক্ষেত্রের 'চিটফান্ড' তা কিন্তু নয়। অনেক ভালো ভালো কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটরও আছেন যারা ভালো পড়ান এবং স্কুলের চেয়ে দ্রুত সিলেবাস শেষ করেন। এক বার পড়া হয়ে যাওয়ার পর অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। স্কুলের উপস্থিতি কমে যাওয়ার এটাও একটা বড় কারণ।

স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমে যাওয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাছাড়া ভাবের আরেকটি বড় কারণ বোধহয় বিনামূল্যের সহজলভ্য বিষয়ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনাগ্রহ। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৫১ সাল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্য করলেন নিয়ম হিসেবে বিনাবেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ থাকার জন্য অনেক ছেলে ছাত্র হিসেবে নাম লেখালেও এদের মধ্যে একটা ভালো অংশ নিয়মিত ক্লাশ করা নিয়ে মাথা ঘামাত না। ফলে শ্রেণীতে উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মূল্য না দিয়ে মানুষ যদি কিছু উপকার পায় তাহলে সেটি সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ থাকেনা। মনস্তত্ত্বের বিচারে যুক্তিবিরুদ্ধ এই অবৈতনিক ব্যবস্থার জন্যই পড়ুয়ারা কলেজমুখী হতে চায় না। বিদ্যাসাগর এই বিশেষ সুবিধাটি প্রত্যাহার করে নিয়ে ১৮৫৪ সাল থেকে ভর্তির জন্য দু'টাকা ও প্রতি মাসে এক টাকা বেতন চালু করলেন। হাতেনাতে এই নতুন নিয়মের সুফল পাওয়া গেল। এতে বিদ্যাসাগরের ভাবনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হল।

শিক্ষার সরকারি ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহ, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যাওয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাছাড়া ভাবের মোকাবিলায় বিদ্যাসাগরের এই অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে বর্তমান অবৈতনিক ব্যবস্থাটি নতুন করে পর্যালোচনা হওয়া উচিত। কারণ সমস্যার মূলে না গিয়ে একতরফাভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর দোষ চাপিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করার প্রয়াস করলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

একান্ত সাক্ষাৎকারে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

‘নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতবর্ষ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে’

তিনি একজন দুঁদে আইনজীবী। কোম্পানি আইনের মামলা-র ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। এমপি হওয়ার পর অ্যাডিসনাল সলিসিটর অব ইন্ডিয়া পদে নিযুক্ত হন। অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আর কেউ নন, বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় যিনি সাধারণ মানুষের কাছে জুলুবাবু নামেও সুপরিচিত। কৃষ্ণনগরের বনেদী পরিবারের মানুষ। পাগলাচণ্ডী রেল স্টেশনের কাছে জামালপুরে তাঁদের পরিবারের দুর্গোৎসবে এলাকার মানুষজন সামিল হন। তাই শুধু রাজনৈতিক তাগিদ নয়, ছিল কৃষ্ণনগরের মানুষদের প্রতি ভালবাসার একটা জায়গা। সেই টানেই এবারেও তিনি ফের কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী। এবারে এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের তাপস পাল, বামফ্রন্টের শান্তনু ঝা এবং কংগ্রেসের প্রার্থী রাজিয়া আহমেদ। তাপস পাল সেই অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য রূপোলি পর্দাতেই। তবুও গত বারের (২০০৯) তিনিই নির্বাচিত সাংসদ। অন্যদিকে গত দশ বছর সাংসদ না থেকেও তিনি ছিলেন মানুষের পাশে। আপাতত এই লড়াই-এ জমে উঠেছে কৃষ্ণনগরের প্রচার।

পঁচাশি বছরেও যেন পঁচিশের তারুণ্য। অসহ্য গরমে সকালের দিকে চলছে ছোটো ছোটো কর্মীসভা। রোদ পড়লে অক্লান্ত পদক্ষেপে জনসংযোগে বেরিয়ে পড়া। এখন অবধি যা সাড়া পেয়েছেন তা অভূতপূর্ব। ব্যস্ত সময়ের মধ্যেই ‘স্বস্তিকা’র প্রতিনিধিকে দূরভাষে দিলেন নাতিদীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকার।

▫ দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে আবার রাজনীতিতে কেন?

▫ কেন নয়? আমি তো রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিইনি। গ্রামের বাড়ির সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। গ্রামের মানুষেরা আমায় সপ্তাহান্তে দেখতে পেতেন। পাগলাচণ্ডী রেল স্টেশনের কাছে জামালপুরে আমার গ্রামের বাড়ি। প্রতি সপ্তাহে আমি সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি। কোনও রাজনৈতিক পদে না থাকতে পারি, কিন্তু জনসংযোগের ক্ষেত্রে কোনও আপস করিনি।

▫ আর এই জনসংযোগের ফলশ্রুতিটা ঠিক কী? মানুষকে কতটা ভালো থাকতে দেখলেন?

▫ মানুষ একেবারেই ভালো নেই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষ। কোনও উন্নয়ন হয়নি। শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার। তার কোনও সুরাহা নেই। স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি।

▫ অর্থাৎ আপনি বলছেন আপনি জিতলে এসব সমস্যার সমাধান হবে?

▫ দেখুন এই সমাধানটা শুধু ব্যক্তি-বিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়। কেন্দ্রের শাসকদল এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আমাদের বিজেপি-র নীতিই হলো মানুষকে তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। তবে সাংসদেরও কিছু কর্তব্য থেকে যায়। যেমন ধরুন এমপি ল্যাডের টাকা ঠিক ভাবে খরচ করা। নিজের কেন্দ্রের সুবিধা-অসুবিধার কথা সংসদে তুলে ধরা ইত্যাদি। আমি জিতলে এগুলো

অন্তত হবে।

■ **যাই বলুন লোকসভা নির্বাচনে আপনি প্রার্থী ঘোষণা হতেই কিন্তু আপনার কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ তাপস পাল আপনার কুশল কামনা করেছিলেন।**

■ সে কী! আমি তো জানি তাঁর একমাত্র কাজ এখন আমাকে খালি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা।

■ **কিন্তু উনি যে বলেছিলেন আপনার বয়স হয়েছে। আপনি ভালো থাকুন। আপনি কিছু বলবেন না?**

■ অবশ্যই। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তিনি একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। তাঁর অভিনয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

■ **বর্তমানে বিজেপি-তে তারুণ্যের জোয়ার। সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় কি তবে এর উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম?**

■ দেখুন, দল কিন্তু এল কে আদবানি, মুরলী মনোহর যোশীর মতো প্রবীণদেরও প্রার্থী করেছে। আজকে বিজেপি যে তারুণ্যের নীতি নিয়েছে তা প্রশংসনীয় ও সমর্থনযোগ্যও। কিন্তু অভিজ্ঞতারও যে একটা দাম রয়েছে তা আমরা বিস্মৃত হইনি।

■ **আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। বাজপেয়ী জমানাতে তো আপনি মন্ত্রী ছিলেন। সে আমলে বিজেপি-র পক্ষে যে ঢেউ উঠেছিল আর আজকের বিজেপি-র পক্ষে জোয়ার তাকে বেশ পেছনে ফেলে দিয়েছে। আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন?**

■ দেখুন, মানুষ কিন্তু আজ অনেক বেশি সচেতন। গত দশ বছরে ইউপিএ জমানার অপশাসনের কথা তাঁরা জানেন। কী বিপুল পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তা কারুর অজানা নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা এর মাশুল গুণছেন সাধারণ মানুষ। এনডিএ জমানার তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি কী ভয়ঙ্কর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা কি নতুন ভাবে বলতে হবে? তাই বর্তমান সরকারের ওপর তিতিবিরক্ত মানুষ এবার এর বিপুল পরিবর্তন করবেনেই।

■ **কিন্তু নরেন্দ্র মোদী কেন?**

■ কারণ নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে ভারতবর্ষ তাদের একজন দেশনেতাকে খুঁজে পেয়েছে। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষাতেই তো তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ দেশের ৫৩ শতাংশ মানুষ তাকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। সময় যত এগোবে, এই শতাংশের হিসেব তত বাড়বে। অন্যদিকে যাকে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বলা হচ্ছে সেই রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখতে চাইছেন মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ। এই পরিসংখ্যানই তো বুঝিয়ে দেয় কেন নরেন্দ্র মোদী।

■ **তাহলে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে এবার সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মার সঙ্গে মোদী-ঝড়ও যুক্ত হলো?**

■ শুধু কৃষ্ণনগর কেন্দ্র বলে তো নয়। নরেন্দ্র মোদীর প্রভাব ভারতবর্ষে তো বটেই, এমনকী এই পশ্চিম বাংলাতেও অনেক হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট করে দেবে।

■ **আপনার কেন্দ্রে লড়াইটা কি এবার দ্বিমুখী?**

■ চতুর্মুখীও হতে পারে। তবে আমার প্রধান প্রতিপক্ষ মনে হয় সিপিএম।

■ **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কোন ভারতবর্ষকে আপনি দেখতে চান?**

■ অবশ্যই সেই ভারতবর্ষকে দেখতে চাই যে ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। আজ পাকিস্তান, চীন এমনকী শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশও আমাদের হুমকি দেয়। এদের বিরুদ্ধে ভারত রুখে দাঁড়াবে। এছাড়া সারা দেশে উন্নয়ন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে তা আশা করবো। আর গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহুরে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কিন্তু গ্রাম-ভারতের সার্বজনীন রূপকে বজায় রেখে দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন।

■ **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন নতুন ভারত গঠনে সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিন— এ আশা করি।**

■ আমিও স্বস্তিকা পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করছি।

এক নজরে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র

মোট ভোটার : ১২,২৩,০৮২ জন।

এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৭টি বিধানসভা—(১) তেহট্ট, (২) পলাশীপাড়া, (৩) কালিগঞ্জ, (৪) নাকাশিপাড়া, (৫) চাপড়া, (৬) কৃষ্ণনগর উত্তর, (৭) নবদ্বীপ।

এই কেন্দ্রে ২টি পুরসভা রয়েছে— কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ।

পঞ্চায়েতের সংখ্যা— ৭৭টি।

বর্তমান সাংসদ তৃণমূল প্রার্থী তাপস পাল ২০০৯-এ ভোট পেয়েছিলেন ৪২.৪৩ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থী জ্যোতির্ময়ী সিকদার ভোট পেয়েছিলেন ৩৫.০৩ শতাংশ। আর এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সত্যব্রত মুখার্জি তখন পেয়েছিলেন ১৬.৭৬ শতাংশ। মোট ভোট দাতার সংখ্যা ছিল ১০,৪৫, ৭১১ জন অর্থাৎ ৪৫.৫০ শতাংশ।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান।। গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন।।

দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালাচ্ছেন কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলা মানেই উৎসবের জোয়ারে মেতে থাকা। বারো মাসে তেরো পার্বণ। এখন চলছে ভোট উৎসব। টালা থেকে টাকি বা বাঁকুড়া থেকে বজবজ সর্বত্র ভোটের হাওয়া। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজ্যরাজনীতির তাপমাত্রার পারদ। তবে গত লোকসভা নির্বাচনের থেকে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের হাওয়া বেশ খানিকটা সরগরম। তাহলে কি মোদী-হাওয়াই এর জন্য কিছুটা দায়ী? শোনা যাচ্ছে এরকমই কানাঘুষো প্রশ্ন। রাজ্য রাজনীতির পরিবেশকে উষ্ণ করতে মোদী-ম্যাজিক দায়ী হোক বা না হোক উত্তর কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর ও বেলগাছিয়া-সহ মোট ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে চষে বেড়াচ্ছেন। মূলত নির্বাচনী হাওয়া-কে মৃদুমন্দ বাতাস থেকে ঝড়ো বাতাসে রূপান্তরিত করেছে তা এক কথায় স্বীকারযোগ্য।

পদ্মফুল হাতে তুলে দিয়ে ভোটের প্রচারে রাহুল সিন্‌হা।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা সম্ভবত সারা ভারতে রাজ্য সভাপতিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তবে রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বেড়ে ওঠা নিতান্তই আর পাঁচটা বিজেপি কর্মীদের মতোই। দুঁদে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার আগে তাঁকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। তবে আজকাল যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার সুবাদে সহজেই রাজ্যসভার সাংসদ বা ভোটে দাঁড়ানোর টিকিট মেলে, তা রাহুলের ক্ষেত্রে ছিল ঠিক ততটাই উল্টো। যুবক বয়স থেকেই দলের হয়ে দেওয়াল লিখন, পোস্টার সাঁটানো থেকে শুরু করে রাজনীতির চৌকাঠে পা রাখা। তারপর ধীরে ধীরে মূল স্রোতের রাজনীতিতে প্রবেশ। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি থেকে দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলে আজ তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি। তবে শুধু এই পদের অধিকারী হয়েই তিনি বসে থাকেননি, প্রায় দুর্বল অবস্থা থেকে বিজেপি-কে আজ পশ্চিমবাংলার বুকে দ্বিতীয় শক্তিধর দল হিসাবেও তুলে আনতে পেরেছেন। অদম্য সাহস, সততা এবং চেষ্টা এই তিনের মিশেলে রাজ্যের বামফ্রন্ট, কংগ্রেস প্রার্থীদের পিছনের সারিতে ফেলে নিজেকে সামনের দিকে টেনে তুলে আনতে তৎপর এই তরতাজা তরুণ নেতা।

উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে রাহুল সিনহার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস প্রার্থী সোমেন মিত্র এবং বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী রূপা বাগচী। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা সেক্ষেত্রে এবারও তাঁকে এগিয়ে রাখলেও উত্তর কলকাতায় জনমত সমীক্ষায় এগিয়ে কিন্তু বিজেপি-র রাজ্য-সভাপতি। এ ব্যাপারে রাহুল সিনহার মন্তব্য, 'এই কেন্দ্রে পাঁচ বছর সাংসদ থেকেও এলাকার মানুষের দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থ

গতবারের নির্বাচিত সাংসদ। গত পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসে থাকার কারণে এই সমস্ত কিছু কর্ণগোচর হয়নি তাঁর। আবার কংগ্রেস প্রার্থী সোমেন মিত্র সম্পর্কে তাঁর মত, ছিলেন তৃণমূলে, টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে দল বদল করে এসেছেন কংগ্রেসে। এবং সারা ভারতে আজ কংগ্রেসের যা অবস্থা, তাঁর অবস্থা তার থেকে কিছু আলাদা হবে না। সবশেষে পড়ে রইল বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী রূপা বাগচী, রাহুলের মন্তব্য— পরাজয় নিশ্চিত জেনে স্থানীয় স্তরের প্রার্থীকে তুলে এনেছে বামফ্রন্ট।

রাহুল সিনহার এক একটি রাজনৈতিক মন্তব্যের বাণে যখন বিদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে বিরোধীদের তখন তাঁর এই বিপুল পরিমাণ আত্মবিশ্বাসের যোগান কোথা থেকে— সে ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হতেই হদিশ মিলল তার। প্রথমত, সারা ভারত জুড়ে মোদী ঝড়, দ্বিতীয়ত, রাহুল সিনহার প্রচারে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি তাঁর প্রধান অক্সিজেন। ইউপিএ ওয়ান এবং ইউপিএ-টু সরকারের একের পর এক দুর্নীতি মানুষকে বোঝাতে বাধ্য করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিই পারে দেশকে রসাতলে পাঠানো থেকে রক্ষা করতে। আর তার প্রধান কাণ্ডারী যেখানে স্বয়ং নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী তখন সেখানে উন্নয়নের ধারা যে অব্যাহত থাকবে তা বলাইবাহুল্য। রাজ্যের ৪২টি আসনে রয়েছে মোদীর সৈন্যবাহিনী, যাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে দেশকে রক্ষা করার। আর সেক্ষেত্রে উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী প্রধান সেনাপতি রাহুল সিনহা।

এক নজরে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র

মোট ভোটার : ১৩,৬৬,৬৪৭ জন।

এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা— (১) চৌরঙ্গী, (২) এন্টালি, (৩) বেলেঘাটা, (৪) জোড়াসাঁকো, (৫) শ্যামপুকুর, (৬) মানিকতলা, (৭) কাশিপুর বেলগাছিয়া।

বর্তমান সাংসদ তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯-এ ভোট পেয়েছিলেন ৫২.৫০ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থী মহঃ সেলিম পেয়েছিল ৪০.০৫ শতাংশ। আর বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায় পেয়েছিলেন ৪.২২ শতাংশ। মোট ভোটদাতা ছিলেন ১০,৪৮, ৮২৭, অর্থাৎ ৪৫.৪৫ শতাংশ।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। বয়সে তরুণ— পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিনি উত্তর প্রজন্ম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর তাঁর পড়াশোনা আছে। তিনি বিবেকানন্দ গবেষক। 'স্বামী বিবেকানন্দস ভিউজ অন দি রোল অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান সোস্যাল পলিটিক্যাল লাইফ : এ কনটেমপোরারি পার্সপেকটিভ' তাঁর গবেষণা গ্রন্থ। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তিনি এ আই সি টি ই এবং ডব্লু বি ইউ টি স্বীকৃত বিভিন্ন কলেজে রেজিস্টার পদে কাজ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুবিদিত। এবারে নির্বাচনী রণে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বামফ্রন্টের সুজন চক্রবর্তী, তৃণমূলের সুগত বসু ও কংগ্রেসের সমীর আইচ। নির্বাচনে জিতলে তাঁর প্রতিশ্রুতি— পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু উন্নয়ন মডেলের মতো এখানেও প্রতি উদ্বাস্তু পরিবারকে স্বনির্ভর করার জন্য ২ শতাংশ সুদে ৫ লক্ষ টাকা করে ২০ বছর মেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করবেন। যাদবপুর স্টেডিয়াম-কে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা, টালিনালা সংস্কার এবং গড়িয়া থেকে কামালগাজী পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি।

ড. ঘোষ সেই অর্থে রাজনীতির লোক নন বটে, কিন্তু সমাজ সেবায় তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

এক নজরে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র

মোট ভোটার : ১৩,৩১,৫৩৭ জন।

এই লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা— (১) বারুইপুর পূর্ব (এসসি), (২) বারুইপুর পশ্চিম, (৩) সোনারপুর দক্ষিণ, (৪) ভাঙড়, (৫) যাদবপুর, (৬) সোনারপুর উত্তর, (৭) টালিগঞ্জ।

এই কেন্দ্রে গত বারে সাংসদ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কবীর সুমন।

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথাগত রায়ের মতে মূল লড়াই সি পি এমের সঙ্গে বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মূল্যবৃদ্ধি, নীতি পঙ্গুত্ব এবং স্বজনপোষণে যে ইউপিএ সরকারের পরিচিতি, তাকে বিদায় দিয়ে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি স্থায়ী কর্মক্ষম সরকার গড়ার লক্ষ্যে কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অধ্যাপক তথাগত রায়। টেলিভিশন বিতর্কের মাধ্যমে তথাগত রায়ের নাম ও চেহারার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, তাঁকে প্রজ্ঞাবান মানুষ ও ক্ষুরধার তার্কিক বলেও চেনেন। কিন্তু তাঁর পুরো পরিচয় হয়তো অনেকে জানেন না। অসম্ভব ভাল ছাত্র ছিলেন— ১৯৬১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ সংস্থার বৃত্তিও পেয়েছিলেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমান বেসু)-এর ছাত্র এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ভারতীয় রেলের আই আর এস ই-তে যোগ দেন এবং কালক্রমে কলকাতা মেট্রোরেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার-এর পদে উন্নীত হন।

কিন্তু সরকারি চাকরি-তে মন না থাকায়— রাজনীতিতে নামার ইচ্ছা তীব্রতর হচ্ছিল। ১৯৯০ সালে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। একই সঙ্গে ভারতীয় জনতাপার্টিতেও যোগ দেন। ২০১০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতির পদও অলংকৃত করেছেন— ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত। ২০০২ সাল থেকে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য। ইংরাজিতে দুটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন— পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বিতাড়নের কাহিনী একটি, অন্যটি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। এছাড়া অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলা ও ইংরাজিতে। সেই ১৯৫২ সাল থেকে কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রটি সকলের নজরে আছে। বরাবর এই কেন্দ্র থেকে ওজনদার প্রার্থীরাই জয়ী হয়ে থাকেন। ১৯৫২-তে জয়ী হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিরহঙ্কারী, সদালাপী, সৎ এবং পরোপকারী মানুষটিকে যাঁরা চেনেন তাঁরাই ভালোবাসেন।

এবারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তৃণমূলের সুব্রত বক্সী, বামফ্রন্টের নন্দিনী মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেসের মালা রায়। তবে শ্রীরায়ের মতে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ সিপিএম। দক্ষিণ কলকাতার কিছু বিদ্বজ্জন অধ্যাপক তথাগত রায়-কে নির্বাচিত করে সংসদে পাঠিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক নজরে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র

মোট ভোটার : ১৫,০৫,৬৩৮ জন।

এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা— (১) কসবা, (২) বেহালা পূর্ব, (৩) বেহালা পশ্চিম, (৪) কলকাতা পোর্ট, (৫) ভবানীপুর, (৬) রাসবিহারী, (৭) বালিগঞ্জ।

২০০৯-এ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকসভা কেন্দ্রে ভোট পেয়েছিলেন ৫৭.২ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থী রবীন দেব ভোট পেয়েছিলেন ৩৫.৪০ শতাংশ। আর বিজেপি প্রার্থী জ্যোৎস্না ব্যানার্জি ভোট পেয়েছিলেন ৩.৯ শতাংশ। মমতা ব্যানার্জি রবীন দেবের থেকে ২,১৯,৫৭১ ভোটে জেতেন। শতাংশের ভিত্তিতে ২১.৮, আর মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৯,১৫,৮৩৬, শতাংশের হিসেবে ৮০.০৮ শতাংশ। ২০১১-তে উপনির্বাচন হয় এই কেন্দ্রে। তৃণমূলের প্রার্থী সুব্রত বক্সী জয়লাভ করেন। যেখানে তিনি সিপিআইএম প্রার্থী ঋতব্রত ব্যানার্জিকে ২,৩০,০৯৯ ভোটে হারান।

চিঠিপত্র

আসন্ন নির্বাচন : বিজেপি'র পথ ও পাথেয়

লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনী যুদ্ধে নেমে গেছে। প্রশ্ন জাগছে বিজেপি তাদের সঙ্গী বিভিন্ন দল যারা এই সেদিনও বি. জে. পি'র বিরোধিতা করেছে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে নিশ্চয়ই সরকার চালাতে পারবে কি? অবশ্যই বিজেপি যদি এই দলগুলিকে নিয়ে বিজয়ী হয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে বিজেপি দলের সমর্থকরা যে হিন্দুত্বের জন্য মনপ্রাণ নিবেদন করেছেন সেই হিন্দুত্ব কি পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে সারা ভারতকে আলোকিত করবে, নাকি প্রতিপদের চাঁদের মতো নামমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে? যদি শেষেরটি হয় তবে তার মতো দুঃখের আর কিছু থাকবে না। এনডিএ-১ এর আমলে হিন্দুত্ব বিষয়ে এজেন্ডা প্রায় ধরা হয় নি। এবারও যদি না ধরা হয় তবে বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবারের সদস্যরা চিরকালের মতো মুষড়ে পড়বেন। ভবিষ্যতে বিজেপি বা কোনো রাজনৈতিক দল যদি হিন্দুত্বের এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচনে নামার কথা ভাবেন বা বলেন তাহলে হিন্দুত্ববাদীরা তাঁদের তাড়া করবেন। অন্য দলের সদস্যরা বিশেষত মুসলিমরা হেসে কুটি কুটি হবেন।

শরিকদলগুলি সম্পর্কে বিজেপি-কে সচেতন হতে হবে। যেমন রামবিলাস পাশোয়ান একবার এন.ডি.এ-তে যোগ দিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন এবং পরে--- বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদকে আক্রমণ করেছেন। বিজেপি যদি এনডিএ-২ সরকার তৈরি করেন তাহলে এরা বিজেপি'র সামান্য হিন্দুত্বের আদর্শকে আঘাত করবে।

অনেকে বলবেন ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ভারতে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। তার উপর ভারতের দুই তৃতীয়াংশ অমুসলমানদের এক বিরাট অংশ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। একথাও মেনেও বলতে হবে ভারতের বিভিন্ন দলের (যেমন সি.পি.এম. কংগ্রেস সমাজবাদী, রাষ্ট্রীয় জনতা দল) সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ হিন্দুত্ববাদী। একটু আবেগ বা ঝড় তৈরি করতে পারলে এরা বিজেপি'কে ভোট দিতেন। ১৯৯২ সালে আদবানীজির রথযাত্রা উপলক্ষে যে উন্মদনা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমার প্রতিবেশী কংগ্রেস-সি.পি.এম কর্মী মায় নেতারা বিজেপিকে আসন্ন নির্বাচনে সমর্থন করবেন জানিয়েছিলেন। এমনকী ১৯৯৮-এর নির্বাচনে এক সি.পি.এম নেতা তাঁর সমর্থক সহ সি.পি.এম দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতাদের হিন্দুত্ব কর্মসূচি থেকে সরে আসার ফলে বিপুল অবিজেপি সমর্থকরা তাঁদের পূর্ববর্তী দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এইটেই মুসলমানদের রণকৌশল। তাঁরা কোনো অমুসলমান দলের সঙ্গে আপোস করেন না। তাঁদের এই 'বুলডগ টেনসিটি' তাঁদের অমুসলিম দেশের ভাগ্য নির্ণায়ক তৈরি করে।

মনে রাখতে হবে, উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার ও তার স্বপক্ষে সমস্ত কর্মসূচি না নিতে পারলে বিজেপিকে আবার পুনর্মূষিক হতে হবে।

—**কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী,** ইচ্ছাপুর,
উঃ ২৪ পরগণা

ব্যাঙ্গালোরে স্বামীজীর প্রচার

ভারতের দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে এবারের স্বামীজীর জন্ম সার্ধশতবর্ষে যেভাবে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে প্রচারের জন্য সময় দিয়েছিল—তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।

এবারের স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে ৮০ লক্ষ টাকার ৪০ রকমের স্বামীজীর বিভিন্ন পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এই পুস্তকগুলির দাম ৩ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। ১৮৬০ টি কলেজ ক্যাম্পাসে স্বামীজীর বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম, কুইজ, প্রবন্ধ, স্বদেশী খেলার আয়োজন করা হয়। ৪২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পুস্তক বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্বামীজীর ১ টাকা দামের ছবিও তার মধ্যে ছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৬ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর পুস্তক বিতরণ হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। আমরা বাংলাতে কী এতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি? আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

—**তরুণ পণ্ডিত,** মালদা।

ধর্মনিরপেক্ষরা আসলে দ্বিচারী, ভীরু ও ভণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের কিছু বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা এতটাই একবগ্গা যে যতই ডান দিকে কন্নিক দেওয়া যাক না কেন তাঁরা বাম দিকে বগ্গা হয়েই থাকবেন। জেহাদ ঘোষণা তো তাঁরাই করেছিলেন যখন ভারতীয় ঐতিহ্য অবজ্ঞা করে অতিথিকে নারায়ণ মনে না করে তসলিমা নাসরিনকে গ্রহণ না করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মামলার ফলাফল বেরুলেই সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যেত, সেই সুযোগ না দিয়ে বইটিকে বাজার থেকে তুলে নিলেন তার অর্থই হলো হেরে গেলেন এবং এতে প্রকাশ পেল তাঁদের একদেশদর্শিতা, অন্তঃসারশূন্যতা ইত্যাদি।

সকল ধর্মের সমান অধিকার মেনে নেওয়াটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সূত্র। কিন্তু আমাদের দেশে কি হচ্ছে? শুধু মুসলমান ভোট পাবার জন্য চলছে কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি। স্বাধীনতার আগে হিন্দু-মুসলমান নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নেবার একটা মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আমি নিজে পূর্ববঙ্গের মানুষ হয়ে সেই মনোভাবের অংশীদার ছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পর সেই মনোভাবের পরিবর্তন এলো। ধর্মনিরপেক্ষ থাকার শপথ নিয়েও অবিরত সংখ্যালঘুদের (খৃস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ছাড়া) উন্নতির নামে মুসলমানদের তোষণ চলছে। এ তোষণ এতো নগ্ন যে কোনো মুসলমান শাসকও করতে পারেনি। সংখ্যালঘুর নাম করে বিশেষ ধর্মের উপর শুধু পক্ষপাত দেখান নয় সরকারি অর্থও ব্যয় করা হচ্ছে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, ইমাম ভাতাদান, হজের অনুদান ইত্যাদি। এ সবই নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই রচিত অথচ মুসলমান গোঁড়া মুসলমান হয়েই থাকছে। তাঁরা ভারতীয় বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। বন্দেমাতরম, ভারতমাতা কি জয় কিংবা জয় হিন্দ বলতে নিষেধ বলে ধর্মীয় কারণ দেখান। আমিও বিশ্বাস করি ধর্মনিরপেক্ষ বলে যাঁরা নিজেদের জাহির করেন তাঁরা আসলে দ্বিচারী, ভীরু, ভণ্ড এবং দুর্বল।

কংগ্রেস এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে

মিহির কুমার সেনগুপ্ত

ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য। আর অন্যদিকে সিবিআই এবং কমিশনের মতো নানা মাধ্যমকে ব্যবহার করে মোদীকে আর তাঁর দলকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। সোহাবুদ্দিন, ইসরত জাহান, জাকিয়া জাফরি প্রভৃতি মামলা বছর বছর চলছে এবং চালাচ্ছে— কিছু রাজনৈতিক স্বার্থ এবং সংকীর্ণ মন, যাতে গুজরাত ও সমস্ত দেশকে কালিমালিপ্ত করা যায়। এদের ভণ্ড, দ্বিচারী ছাড়া আর কি বলা যায়?

কাশ্মীরি মুসলমানদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ কাশ্মীরি পণ্ডিত বছরের পর বছর নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের নিজ গৃহ ফিরে পাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না অথচ নির্দোষ করসেবকদের যারা পুড়িয়ে মারল তাদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য ব্যানার্জি কমিশন বসানো হলো।

গোধরা কাণ্ডের পরবর্তী এবং ইন্দিরা হত্যার পর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো সমপর্যায়ের হলেও মোদী এবং তাঁর দলকে দোষী প্রমাণ করার জন্য কতই না চেষ্টা। কিন্তু ভণ্ড, নিরপেক্ষ দলগুলির দুর্ভাগ্য যে এত চেষ্টা করেও তাঁকে আর তাঁর দলকে কোনো বদনাম দেওয়া হলোই না, তবে কমিশন একটা বসান হয়েছিল শুধু তাদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য।

সমগ্র ভারত তো বটেই, সমগ্র পৃথিবীর লোক জানে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও কি করেছিলেন। সেদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের বাংলোয় রুদ্ধদ্বারে বসেছিলেন আর টি ভি দেখছিলেন যতক্ষণ না বাবরি ধাঁচা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তখন তাঁর সঙ্গে কারও দেখা করা নিষেধ ছিল। তখনকার রাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মা সব কিছুই জানতেন। তাই যখন শারদ পাওয়ার আর বহুরাজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তিনি কেঁদে ফেলেন আর বলেন এমন অসহায় অবস্থা দিল্লীতে আর কখনও হয়নি। আমরা জানি যে কোনো রাজ্যপাল কেন্দ্রের চোখ এবং কান, কিন্তু তিনিও কি বাবরি ধাঁচা ধ্বংস ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কোনো পদক্ষেপ নেবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন? এর পরেও কি সন্দেহ হয় না যে ওই বিশাল বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হবার পিছনে কোনো বিশেষ শক্তির হাত ছিল? এর উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি আর পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও নিজেকে আর তাঁর দলকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেন কি করে? তবে লিবারহান কমিশন বসেছিল নরসিমা রাওয়ের ভূমিকা নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি। মাত্র অটলবিহারী বাজপেয়ীকে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের জন্য দায়ী করে বিশাল রিপোর্ট দিলেন আর নরসিমা সরকারের সব দোষ স্খালন করে একটা ক্লিন চিট দিলেন।

আজকাল যাঁরা এবং যে দল ধর্মনিরপেক্ষ বলে নিজেদের জাহির করেন বা প্রচার করেন তাঁরা মুসলমান ভোট পাবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির সংজ্ঞাই পালটে দিয়েছেন। যে যত হিন্দুবিরোধী আর মুসলমান হিতৈষী সে ততই ধর্মনিরপেক্ষ। এর ফলে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এক অংশ অন্য অংশকে শত্রুপক্ষ ভাবতে আরম্ভ করেছে। আর এই প্রবণতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় একদিন পৌঁছোবে যাতে ভারত আবার টুকরো হবার সম্ভাবনায় পৌঁছে যাবে।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদেও একটা বিল আনে যার নাম 'প্রিভেনশন অফ কমিউনাল অ্যান্ড টারগেটেড ভায়োলেন্স অ্যাকসন বিল-২০১১'। এর আসল কথা হলো যদি কোনোও কারণে কোথাও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি নষ্ট হয় তার দায় বর্তাবে কেবল হিন্দুদের উপর, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই বিল আজ পর্যন্ত পাশ হয়নি। যত দোষ নন্দঘোষ। এর পরেও বলতে হবে নরেন্দ্র এবং তার দল হলো সাম্প্রদায়িক আর সবাই ধর্মনিরপেক্ষ।

পরম্পরা

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন

মৎস্যাবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন, ‘‘পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।’’ সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। এই বিশ্বাসই অবতারবাদ; যা হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম। আমাদের পুরাণ সাহিত্যে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে ঈশ্বরের নানাবিধ অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে মৎস্যাদি দশ অবতার প্রধান। আজও মানুষ এই দশাবতারের নিত্য স্মরণ করে। এই দশাবতারের প্রতি ভারতীয়দের এত শ্রদ্ধার কারণ কী? তার কারণ,

দশাবতার কাহিনী ভারতীয় রাষ্ট্র তথা জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। লক্ষ্য করার বিষয়, গীতায় অবতার সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে, ‘ধর্ম-সংস্থাপন’। এই ধর্ম ব্যাপারটি হলো, যার সাহায্যে মানুষ ঐহিকজীবনে সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। আর ‘ধর্মসংস্থাপন’ ব্যাপারটি কী? মানুষ সামাজিক জীব। সে নির্ভয়ে, সুখে, শান্তিতে থাকার জন্য অন্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে সুশৃঙ্খল সমাজ সৃষ্টি করেছে। বিশৃঙ্খল সমাজে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রয়োজনীয় স্থিরতা ও সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ। সমাজের উন্নতির অর্থ, প্রতিটি ব্যক্তির নিজ নিজ গুণ ও সামর্থ্য অনুসারে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ। এই সুখ-সমৃদ্ধি লাভের উপায় সৃষ্টি করাই ‘ধর্মসংস্থাপন’। দশ অবতারের প্রতিটি অবতারে পরমেশ্বর এই ‘ধর্ম-সংস্থাপন’ করেছেন বলেই আজও আমরা তাঁদের নিত্য স্মরণ করি।

সংস্কৃতি হলো সমাজের আত্মা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোন কোন গুণের প্রাধান্য এবং কোন-কোন দোষ পরিত্যাজ্য, তা এই দশাবতার জীবন চরিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ভোগবাদ আমাদের দেশে যে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করে চলেছে, দশাবতার কাহিনী তা থেকে আমাদের উদ্ধার করবে; কারণ, ভারতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবনের চাবিকাঠি এই দশাবতারের জীবনকথায় নিহিত রয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবনের বিকাশ ও তার স্বরূপ এবং বারংবার নানা প্রলয় সঙ্কট থেকে কেমন ভাবে আমরা উদ্ধার লাভ করেছি তারই ইতিহাস এই দশাবতার চরিত। তাছাড়া এই কাহিনী সমূহতে আমরা ভারতীয় জাতি (Nation) গঠনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। ইংরেজের ‘শয়তানি ইস্কুল’-এ পড়ে আমরা যে ছিন্নমস্তা শিক্ষা লাভ করেছি, তাতে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, ইংরেজ আসার আগে আমাদের কোনো ‘Nation’ ছিল না। তারাই আমাদের Nation গড়ে দিয়েছে। দশাবতারের জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজের তৈরি এই তত্ত্বটি কত বড় এক মিথ্যার সুনিপুণ বেসাতি। ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয় তার জাতীয় সংস্কৃতিকে অস্বীকার করছে বলেই তার সামনে আদর্শহীন নিরাশাময় জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে সমাজ আজ স্বার্থলোলুপ, সামর্থ্যহীন, কলহপ্রিয়, প্রতিকার-অক্ষম হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা লক্ষ্যই করিনি সেই কোন আদিমকাল থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের ধারা দশাবতার চরিত কথার রূপকের অন্তরালে কেমন অখণ্ড অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত, যা বিনাশহীন, গৌরবময় ও বিশ্ববিজয়ী। দশাবতার কাহিনীর মধ্যে স্বাভিমানী, তেজস্বী, যশস্বী জীবন যাপন করার দুর্দমনীয় উৎসাহ আমরা অনায়াসেই

পেতে পারি। দশ অবতারের প্রথম মৎস্যাবতার। ভারতীয় সংস্কৃতির ঊষাকালে, যে সময়ে হিমালয় উপত্যকা ভূমির সঙ্গে দক্ষিণের সমভূমি সংযুক্ত হয়েছিল এবং দক্ষিণের নৈঋত অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাচীন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, সেই সময় দক্ষিণ সমুদ্রতীরে বসবাসকারী মানুষ উত্তর অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে। এইসব জাতি সাধারণ ভাবে অসংস্কৃত ছিল, এদের মধ্যে প্রায় একই রকমের মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। মনে হয়, এই কারণে এরা মৎস্য নামে পরিচিত ছিল। কিম্বা তাদের গোষ্ঠীর কোনো নেতার নাম ছিল মৎস্য। তাছাড়া এরা এত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে জলে চলাফেরা করতো যে, স্থলভাগের মানুষরা এদের 'মৎস্য' বলতো। এই তত্ত্বের সমর্থনে আমরা মহারাষ্ট্রের লোককথায় (বখুরী) ইংরেজ ও ফরাসীদের জলচল জাতি হিসেবে বর্ণনার কথা বলতে পারি। যা হোক 'মৎস্য' অর্থে মাছ নয়, একটি বিশেষ জলচল জাতিকেই বোঝায়।

মনু হিমালয়ের পশ্চিম দিকের ঢালু অঞ্চলে বসবাস করতেন। প্রচলিত লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী হিমাচল প্রদেশের মানালী অঞ্চলের এক গ্রামে তাঁর আশ্রম ছিল; যেখানে তাঁর স্মৃতিতে এখনও প্রতি বৎসর উৎসব হয়। বিপুল বিদ্যা ও তপস্যার জন্য লোকসমাজে মনুর অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর ছিল। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম দয়া ও অনন্ত সহানুভূতি। তাই শত্রুদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মৎস্য (জলচর ব্যক্তি) তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অভয় দিয়ে রক্ষা করেন।

এই মৎস্য জাতির মতো আরও বহু জাতি দক্ষিণ দেশে বসবাস করতো। এইসব জাতির মধ্যে সদা-সর্বদা বিবাদ লেগে থাকতো। এই বিবাদের জন্যই 'মৎস্য' জাতি তিতিবিরক্ত হয়ে উত্তর ভারতে মনুর আশ্রমে আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। সম্ভবত আফ্রিকা থেকে বিযুক্ত হবার পর, বিশেষত আফ্রিকার এই প্রদেশ সমুদ্রে বিলীন হওয়ার পর 'রাক্ষস' নামে অপর এক জাতি নিজ বাসভূমি নির্মাণের জন্য ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে অন্যান্য জাতিদের পর্যুদস্ত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। এইসব পর্যুদস্ত জাতির মধ্যে 'মৎস্য' জাতির লোকেরা দলে দলে উত্তরভারতে মনুর আশ্রমে নিরাপদ অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এই যে অল্পদিনে তাদের বিপুল বৃদ্ধি, পৌরাণিক দৃষ্টিতে তা মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধিতে পরিণত হলো। এই মৎস্য জাতির লোকেরাই মনুকে আসন্ন জলপ্রলয়ের কথা (সুনামি) অনেক আগেই বলে দিয়েছিল। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। আমরা জানি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পশুপক্ষীরা শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অনেক আগেই পেয়ে থাকে। যা হোক, প্রলয় কালে কঠিন পরিশ্রম করে মানুষ সেদিন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। মৎস্যাবতারের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে, এই সহজ-সরল সত্যটিই প্রতিভাত হয়েছে। মৎস্য জাতির লোকেরা উত্তরাঞ্চলে এসে দক্ষিণাঞ্চলে আর ফিরে যায়নি। তারা রাজস্থানের পূর্বাংশে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মহাভারতের যুগে যে রাজ্যের রাজা ছিলেন বিরাট। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে (বুদ্ধের আবির্ভাবকালে) ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মৎস্য রাজ্যের উল্লেখ পাই। আধুনিক জয়পুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে আলোয়ার রাজ্যের সমগ্র ও ভরতপুর রাজ্যের কিয়দংশ নিয়ে এই রাজ্য গঠিত ছিল। রাজস্থানের এই অংশের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে 'মৎস্য-সঙ্ঘ' গড়ার আধুনিক প্রচেষ্টার কথা আমরা সবাই জানি। সুতরাং মৎস্য 'মাছ' নয়, একটি জাতি বিশেষ। আর মৎস্য অবতার সেই জাতির পুরোধা পুরুষ, যিনি মহর্ষি মনুর সাহায্যে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন।

সেই প্রাচীনকালে মৎস্য ও রাক্ষসদের যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল, রামাবতারের কাল পর্যন্ত সেই শত্রুতা চলতে থাকে এবং রাবণের মৃত্যুতে তার সমাপ্তি ঘটে। সেই সময়ে এই মৎস্যদের নাম ছিল 'বানর'। বানর-প্রধান হনুমান রাক্ষসদের উপদ্রবের স্থায়ী সমাধান কল্পে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলে ; যার সহায়তায় শ্রীরাম রাবণকে সংহার করেন। এই সংগঠনের সাহায্যে হনুমান প্রথমে 'সৌরমণ্ডল' নামক নিজ বাসভূমিকে রাক্ষসমুক্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনাটির পৌরাণিক সংস্করণ হলো, হনুমান জন্মের পরেই সৌরমণ্ডলে লাফিয়ে ওঠে এবং পড়ে গিয়ে তার হনুটি ভেঙে যায়। এই 'সৌরমণ্ডল' দাক্ষিণাত্যের করমণ্ডল অঞ্চল। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের করমণ্ডল অঞ্চল, যার প্রাচীন নাম 'চৌরমণ্ডল'। এইভাবে মৎস্য নামের নানা পরিবর্তন হলেও এদের জলে চলাচল করার কৌশল কিংবা পরোপচিকীর্ষার গুণ লুপ্ত হয়নি। এদেরই নেতা হনুমান নৌকাযোগে লঙ্কায় গিয়েছিল। নৌকা নোঙ্গর করা অর্থে সংস্কৃতে 'লাঙ্গল' কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই লাঙ্গল হয়তো লিপিপ্রমাদ বা উচ্চারণ প্রমাদ বশত লাঙ্গুল (লেজ)-এ পরিণত হয়। এই মৎস্যদেরই উত্তরপুরুষ শিবাজীর 'মাওলী' জাতি। কারণ তাদের মাতৃভূমি এক এবং পরোপকার, সহনশীলতা, চপলতা ও জলবিচরণ গুণাবলী এই মাওলী জাতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদভাগবতের অষ্টম স্কন্দের চব্বিশ অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে মনে হয়, মহর্ষি মনু উত্তরাঞ্চলে বসবাস করলেও তাঁর পরিবারের মূল ধারা দক্ষিণ ভারতেই ছিল। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, দ্রাবিড়েশ্বর সত্যব্রতের জন্যই মৎস্যাবতারের সৃষ্টি। মৎস্যাবতার সত্যব্রত রাজাকে যা কিছু বলেছিলেন, তাই মৎস্যপুরাণ। এই সত্যব্রত রাজাই পরবর্তীকালে মনু হয়ে জন্মেছিলেন। এই কাহিনী অনুসারে ধরে নেওয়া যায় যে, প্রলয়ের কিছুকাল পূর্বেই মনু দক্ষিণাঞ্চল ছেড়ে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। মনুর মনে তাই দাক্ষিণাত্য প্রীতি

থাকা স্বাভাবিক। আবার দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে উত্তরের মানুষদের মনুর প্রতিও মৈত্রীভাব জন্মেছিল। ফলে মনুর পক্ষে এদের নেতৃত্ব দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। রাক্ষসদের অত্যাচারে গৃহহীন, ভূমিহীন মৎস্যদের মনুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা তাই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এরপরে এরাই মনুর নেতৃত্বে মহাপ্লাবনের সময় নিজেদের এবং উত্তরাঞ্চলের লোকেদেরও রক্ষা করেছিল। বিপদাপন্ন মানুষকে সাহায্য করা একটি দৈবী গুণ, সব মৎস্যজাতির মধ্যে একটু বেশিই ছিল। তাই এই ঘটনা পরবর্তীকালে পুরাণকারদের লেখনীতে পল্লবিত হয়ে মৎস্য অবতারের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে ও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

এই ঘটনা, অর্থাৎ ভারতের উত্তর দক্ষিণের মানুষের সার্বিক সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্লাবন থেকে মানবজাতির উদ্ধার মহর্ষি মনুর মনে এক নূতন ঊষার স্বর্ণাক্ষরে উন্মোচন করে। তিনি সেদিন এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যারাই ভারতীয় তারাই আপনজন, সে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কিংবা মধ্যাঞ্চল যে এলাকার বাসিন্দা হোক না কেন। 'Nation' দানা বাঁধল সেদিন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মনু সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করলেন। আর এর মধ্য দিয়েই ভারত ইতিহাসের এক অভিনব যুগ শুরু হলো। তিনি তাঁর এই গভীর উপলব্ধি মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। তৈরি হলো ভারতীয় Nation। পরবর্তীকালে মনুর প্রভাব এত গভীর হয়ে উঠল যে, যুগ বুঝাতে মন্বন্তর (মনু+অন্তর) কথাটি ব্যবহৃত হতে লাগল। এই মনুই মানব ধর্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করলেন। মনুর সন্তান, অর্থাৎ মনু প্রণীত সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারক-বাহকগণই আজকের মানব। তাই আজও আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ভক্তিভরে নিত্য মনুর কথা স্মরণ করি, কারণ তিনিই মৎস্যাবতারের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক Nation গঠন করতে প্রথম সমর্থ হয়েছিলেন। আজও সেই Nation তত্ত্ব ফল্গুধারার মতো ভারতীয় সমাজে প্রবহমান।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া   প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

আনন্দ-পাঠ

নবাঙ্কুর

পিনাকী-স্যারের কাছে বানান শেখা

কৌশিক গুহ

বাংলা বানান নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছিল বিপুল। কেউ কেউ বলত নিচের দিকে ক্লাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ না পড়ার জন্যেই এত সমস্যা। পিনাকী-স্যার বলতেন, 'ওটা কোনো যুক্তি নয়। প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ না পড়েও অনেকে নির্ভুল বানান লেখে। আবার ওই দুটো বই মুখস্থ করেও বানান ঠিকমতো করতে পারে না বহু ছাত্র। আসলে বানান শিখতে গেলে চোখ আর কানকে তৈরি করা চাই। ঠিকমতো উচ্চারণ প্রথমে দরকার। তারপর করেন পিনাকী-স্যারের শেখানোর পদ্ধতি। সহজ করে বুঝিয়ে দেন সবসময়। ছোটোদের শুধু নয় বড়োদের সমস্যা হয় বানান নিয়ে। পিনাকী-স্যার বলেন, 'আমরা জন্মাবার পর শুধু কাঁদতে পারতাম। তারপর একটু একটু করে শিখি অনেক কিছু। বানান ভুল হয় বলে একটুও ঘাবড়াবে না। কয়েকটা নিয়ম মনে রাখলে ভুল কম হবে। তবে চোখ কানকে সতর্ক রাখতে পারলে বানানগুলোর শুদ্ধ রূপ মনে গেঁথে যাবে। প্রথম দিকে ভুল শিখলে বড়ো হয়ে শোধরানো একটু কঠিন।' কোথা থেকে এসেছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ এসেছে প্রচুর। সেইসব শব্দের ওজন আর গাম্ভীর্য রয়েছে। সেসব শব্দে একটুও বদল হবে না। তবে কয়েকটা বদল মেনে নেওয়া হয়েছে। যেমন রেফ-এর দ্বিত্ব হবে না। হসন্ত আর বিসর্গ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার হবে না। আমরা লিখবো সর্ব, খর্ব, গর্ব, মর্ম, ধর্ম, কর্ম, চর্ম, অর্ক ইত্যাদি। দেবাশিস্ শুভাশিস্ থেকে 'হস-চিহ্ন' বাদ দিলে ক্ষতি নেই। আমরা লিখবো ক্রমশ, বস্তুত, স্পষ্টত, প্রথমত। ওইসব শব্দ শেষে বিসর্গ লেখার দরকার নেই। আঞ্চলিক শব্দের ক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণ অনুসরণে লিখবো। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে সহজ

শব্দটাকে দেখা। আমরা প্রত্যেকেই প্রথমে শুনতে শিখি। তারপর পড়া। যখন ছোটো থাকি তখন যদি এমন কারও কাছে গল্প বা অন্য কিছু শোনা যায় যাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট আর নির্ভুল, তাহলে শুনে শুনে কান তৈরি হবেই। পড়তে শেখার পর অক্ষরগুলো ছবির মতো রূপ নেবে। মনে গেঁথে যাবে।'

শুভাশিস নিজের নামের বানান বরাবর ভুল লিখত— এটা আগে কেউ কখনও তাকে বলেনি। পিনাকী-স্যার বললেন, 'তুমি খাতায় বার বার নাম লিখছো 'শুভাশীষ'। অন্য স্যারের কাছে লিখতে পারো ওই বানান। আমার ক্লাসে শুভাশিস লিখতে হবে।' এখন নিজের নামটার শুদ্ধ রূপ বার বার লিখে রপ্ত করছে শুভাশিস। বিপুলদের ক্লাসের সিতাংশু নিজের নাম ঠিক লিখত। বাংলার স্যার ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, 'তুমি লিখবে সীতাংশু।' পিনাকী-স্যার বললেন, 'ওদের ভুল বানান শেখাচ্ছেন কেন? হয় শীতাংশু লিখবে, নয় সিতাংশু।' পিনাকী-স্যার অঙ্ক পড়ান। বাংলাও খুব ভালো জানেন। হেডস্যার রঞ্জিত রায় খুব পছন্দ

বিপুলরা শিখে নিয়েছিল শ স ষ, র ঢ় ড়, ন ণ— এই অক্ষরগুলোর উচ্চারণ ও ব্যবহারের পার্থক্য। পিনাকী-স্যারের কথাগুলো মনে আছে, 'বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক রকম শব্দ রয়েছে। ভাষাকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখতে গেলে চারপাশের জানালা খোলা রেখে মুক্ত হাওয়াকে ঢুকতে দিতে হয়। তাই-ই হয়েছে। বানানোর নিয়মরীতি নিয়ে বিস্তর ভেবেছিলেন কিছু সুযোগ্য মানুষ। তাঁরা প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ কেমন হবে আর লিখিত রূপ কীরকম দাঁড়াবে তা ঠিক করেন। আমরা তা মানছি। ভাষার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকা চাই। নয়তো যেমন খুশি চলবে। তাতে ক্ষতি হয়ে যাবে অনেকটাই।'

দেবাশিস প্রশ্ন করেছিল, 'তৎসম-তদ্ভব আর বিদেশি শব্দ নিয়ে সমস্যা হয় খুবই। কীভাবে এই সমস্যা পেরোন যাবে?' পিনাকী-স্যার বলেছিলেন, 'খুব ছোটোবেলায় ওইসব নিয়ম শেখা যাবে না। তাতে সব গুলিয়ে যেতে পারে। একটু বড়ো হয়ে জেনে নিতে কোনও অসুবিধে নেই কোন্ শব্দটা

পদ্ধতি মানা হবে। যেমন লেখা হবে পরগনা, কমপিউটার, মুসলমান। লিখবো না পরগণা, কম্পিউটার, মুসলিম।'

পিনাকী-স্যার বললেন, 'ভালো করে বানান রপ্ত করলেই ভাষা শেখা যাবে না। ভাষা শিখতে গেলে প্রচুর পড়তে হবে। নানারকম বই পড়া চাই। লেখার আগে দুটো শব্দ আছে শোনা, পড়া। প্রতিটি অক্ষর ছবির মতো আমাদের মনে গেঁথে যায়। সবই সাংকেতিক চিহ্ন। আস্তে আস্তে চিনে নিতে হয়। লিখতে লিখতে ভাষা আর সাহিত্যের মধ্যে যে মজাটা আছে তা পেয়ে যাবে। শুধু বানান শিখলে চলবে না। শেখা শব্দকে সাজাতে হবে বাক্যে। ওইভাবে বড়ো লেখকরা কত কিছু লিখেছেন।'

বিপুলরা পুরনো ছাত্রদের কাছে শুনেছে, 'পিনাকী-স্যার আমাদের বাংলা শিখিয়েছিলেন যত্ন করে।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

সপ্তর্ষি আর শরদিন্দুর বই

বই নিয়ে নানান কথা শুনতে ভালো লাগে সপ্তর্ষির। তার একটা ছোট্ট নোট বই আছে। ঠাকুমা কিনে দিয়েছিল। তাতে লিখে রাখে পছন্দের কথা। কোথাও কিছু পড়ে ভালো লাগলে লিখে রাখে। কারও মুখে মনে রাখার মতো কিছু শুনলে লিখে ফেলে খাতায়। তার খাতার আর বেশি পাতা সাদা নেই। যখন কোনো কাজটাজ থাকে না খাতার পাতা ওল্টায়। কত কথা মনে ভেসে ওঠে। দিনগুলো চলে গেছে, রয়ে গেছে কিছু স্পষ্ট স্মৃতি। প্রথম যখন লেখা শুরু করেছিল তখন নিচের দিকের ক্লাসের ছাত্র। হাতের লেখা ভাবনা একরম ছিল। দিনে দিনে পাল্টেছে। বেশ মজা লাগে সপ্তর্ষির। ঠাকুমার কথা মনে পড়ে খাতাটা হাতে নিলেই। ঠাকুমা তাকে ছোটো থেকে পড়ায় উৎসাহ দিয়েছে। কত কিছু উপহার দিয়েছে, সেইসঙ্গে বইও। ঠাকুমা নিজে প্রচুর পড়ত। পড়ার অভ্যেসটা ঠাকুমা তৈরি করে দিয়েছে। বই উপহার দিলেও কখনও পড়তে বলেনি। বরং বলেছে, 'হয়তো এসবের মধ্যেও খুঁজে পাবে আনন্দ।' সপ্তর্ষি বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে অন্য জগৎ। বইকে সে বন্ধু করে নিতে পেরেছে। বড় ভালো বন্ধু বই— এটা সবসময় বলে। বই-ই তো এগিয়ে দেয় সামনের দিকে।

সপ্তর্ষি তার নোট-খাতায় দেখতে পেলো একটা পাতায় লেখা : ভালো বই কল্পনাশক্তিকে বাড়ায়। কল্পনাশক্তি বাড়ায় সৃজনশীলতা। আর সৃজনশীলতা থেকে বাড়ে অতি উন্নত চিন্তাশক্তি। আর সেই জ্ঞানই একেকজনকে সমাজে জ্ঞানী মানুষ হিসেবে পরিচিত করে তোলে। বই আমাদের জীবন গড়তে সাহায্য করে। তা সঙ্গী হয়ে থাকে সারাজীবন। প্রত্যেকের প্রতিদিন কমপক্ষে তিরিশ মিনিট পড়া দরকার। বাড়িতে একটা লাইব্রেরি গড়ে তুললে ভালো। যদি বাবা-মায়েরা ২০টা বই দিয়ে লাইব্রেরি গড়ে দেন, তাহলে ছেলেমেয়েরা ২০০ বইয়ের গ্রন্থাগার করবে। আবার তাদের ছেলেমেয়েরা ২০০০ বইয়ের গ্রন্থাগার গড়ে তুলবে। আর এইভাবে লাইব্রেরি গড়লে তা মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠবে।' কথাগুলো কয়েকবার পড়ল সপ্তর্ষি। বলেছিলেন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম।

সপ্তর্ষিকে কদিন আগে পিসেমশাই কিনে দিয়েছে 'শরদিন্দু অমনিবাস।' মোট বারোটা খণ্ড। সুন্দর বাঁধানো। সব বই এখন হয়তো পড়বে না। পরে পড়বে। সংগ্রহে রইল। বই পেয়ে খুব খুশি। সে বই যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। মন দিয়ে পড়ে। কোনও কোনও পছন্দের বই অনেকবার পড়েও নতুন মনে হয়। এখানেই তো মজা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের জন্যে কিছু লিখেছেন। একটা খণ্ডে শুধু ছোটোদের লেখাগুলো আছে। ওই বইটা ঠাকুমা দিয়েছিল সপ্তর্ষিকে। বইটা একজন নিয়ে হারিয়ে ফেলেছিল। ঠাকুমার স্মৃতি-জড়ানো বই বলেই কষ্ট হয়।

বইমিত্র

সদানন্দের ভ্রমণ

নারী স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বয়স যখন বাধা

স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের যুগ প্রগতিশীলতার যুগ। নারী-পুরুষ উভয়ই এই প্রগতির ভাগিদার। যোগ্যতার বিচারে নারী পুরুষের থেকে পিছিয়ে নেই। তা সে লেখাপড়ার জগৎই হোক বা চাকুরির জগৎ হোক।

ভারতে এই মুহূর্তে মহিলাদের মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— (১) আর্থিকভাবে যাঁরা স্বচ্ছল, (২) কর্মরতা মহিলা, যাঁরা সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করেন, (৩) শিক্ষিতা কিন্তু বেকার। দুঃখের বিষয়, এই মুহূর্তে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষের শ্রেণীটিতেই সবচেয়ে বেশি মহিলা রয়েছেন। এককথায় যাঁরা শিক্ষিতা কিন্তু বেকার। এঁরাই তাঁরা, যাঁরা অধিকারের জন্য লড়ছেন কিন্তু অধিকার পাচ্ছেন না। ভারত যেহেতু একটি উন্নয়নশীল এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ সেহেতু বেকার সমস্যার কথা উঠলে বেকার ছেলেদের কথাই ভাবা হয় বা বলা হয়। এখানে মেয়েরা অর্থাৎ কর্মহীন মেয়েরা এখানে হিসাবে স্থান পায় না।

বর্তমান ভারতে মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের কথা উঠলেই দু'ধরনের মহিলাদের আমরা দেখতে পাই— একদল হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা জীবিকার নামে বল্গাহীন অসভ্যতা ও নোংরামি করতে প্রস্তুত বা করেন, আর একদল যাঁরা ভদ্র, সভ্য জীবিকার মাধ্যমে সমাজে মাথা উঁচু করে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চান। সমস্যাটা এই ভদ্র সভ্য মেয়েদের নিয়ে, যাঁরা জীবিকার জন্য অধঃপতিত হতে চান না, যাঁরা নেচে গেয়ে প্রচারের আলোয় থাকার জন্য নোংরামি করতে পারেন না। এই প্রকৃত শিক্ষিতা বেকার মেয়েদের বিপদ শিক্ষিত বেকার যুবকদের চেয়েও বেশি। কারণ, শিক্ষিত বেকার যুবক তবু হয়ত ব্যবসা করে টিকে থাকার চেষ্টা করবেন, এই শিক্ষিতা বেকার মেয়েরা সেটাও পারবেন না। কারণ আমাদের দেশ যেহেতু সামাজিকভাবে পিছিয়ে, সেহেতু একটি

মেয়েকে আজও আমাদের সমাজ ব্যবসায়ী বলে মেনে নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ভারতে বেশির ভাগ রাজ্যই তার কন্যা সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এই পরিস্থিতিতে একটি মহিলার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। এই মুহূর্তে সারা দেশে দুষ্কৃতীদের যে দৌরাত্ম্য চলছে সেই অবস্থায় একটি মেয়ের পক্ষে রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া দাঁড়ানো অসম্ভব। রাষ্ট্র মহিলাদের এই স্বনির্ভরতার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই আজ সবচেয়ে বড় বাধা। সম্মান নিয়ে একা বেঁচে থাকার কথা ভদ্র, সভ্য মেয়েরা আজ স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না।

প্রকৃত শিক্ষিতা কিন্তু বেকার এই যুবতীরাই জাতীয় সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক। এঁদেরই স্বনির্ভরতার প্রয়োজন আর এই প্রয়োজন একমাত্র রাষ্ট্রই পূরণ করতে পারে। সরকারের হাতে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র রয়েছে। অধিকাংশ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেখানে চাকরির প্রার্থীদের বয়সক্রম অত্যন্ত কম, বিশেষ দু'একটি শ্রেণীর প্রার্থীদের বিষয়টি বাদ দিয়ে। চাকরি যেহেতু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেহেতু এক্ষেত্রে বয়সসীমা বাড়ানো উচিত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে আরও বেশি বাড়ানো উচিত। কারণ একটি মেয়েকে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠতে হয়। সেক্ষেত্রে তার চাকরির সময় যদি তাকে ক্ষুদ্র বয়সসীমার গণ্ডিতে বেঁধে রাখা হয় তাহলে তার স্বনির্ভরতার পথে এই বয়সসীমাই হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড় কাঁটা, প্রতিবন্ধকতা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই চাকরির বয়সসীমা মাত্র ২৭ বছর। এটা একেবারেই হাস্যকর। পুরুষ বা নারী, উভয়কেই ঠিকমত দাঁড়াতে যে সময় নিতে হয় তা নিতে নিতেই তো ২৫-২৬ বছর পার হয়ে যায় তারপর শুরু হয় সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি। যার জন্য চাই যথেষ্ট সময় এবং অধ্যবসায়। এতটুকু বয়সসীমার গণ্ডির মধ্যে তা অসম্ভব। ছেলেমেয়ে সকলের ক্ষেত্রেই এটা অসম্ভব এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি আরও অসম্ভব। শুধু তাই নয়, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য অন্তত ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা উচিত। এবং তা অতি শীঘ্রই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে সুশিক্ষিতা ভালো মেয়েরা জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা বেসরকারি সংস্থাগুলিতে কাজ করেন। অনেকে লেখাপড়ার ধারা অনুসারে বেসরকারি ক্ষেত্রেই চাকরি পান, অনেকে আবার সরকারি চাকরি না পেয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করেন। এই নারীরা আরও অসহায়। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই মহিলারা তাঁদের 'বস'দের সেবিকায় পরিণত হয়েছেন। এক্ষেত্রে যাঁরা রুখে দাঁড়ান, প্রতিবাদ করেন, তাঁদের চাকরি খোয়াতে হয়। শেষে একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে, প্রকৃত ভদ্র, সভ্য সুশিক্ষিতা মেয়েরা আমাদের এই ঝাঁ-চকচকে সমাজে আজ বড় অসহায়। না তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা আছে, না আছে তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

অতিথি কলম

মজফ্‌ফর হোসেন

উত্তরপ্রদেশ : সপা দিয়েছে ধোকা, বসপা দিয়েছে নুনের ছিটে

উত্তরপ্রদেশে প্রার্থীদের নাম চয়ন করার জন্য বিজেপি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিশ্রম করেছে। কেননা এটা এমন একটা প্রদেশ যেখান থেকে যে কোনো দলের ক্ষমতায় বসার জন্য ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এজন্য বিজেপি নেতাদের সামনে প্রশ্ন ছিল না যে কোন দিগ্‌গজকে কোন নির্বাচন ক্ষেত্রে নামানো হবে, বরং প্রশ্ন ছিল কে কাকে হারিয়ে জয়ী হতে পারবে। উত্তরপ্রদেশকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে যত খুশি বিভক্ত করা যাক কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক বিভাজন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য উত্তরপ্রদেশ বিজেপি নেতাদের মনোভূমিকা বুঝতে বিবশ হয়ে পড়েছে। বাইরে যা কিছুই হোক, কিন্তু যখন ক্ষমতায় আসার জন্য দলের নীতিনির্ধারণের সময় আসে তখন প্রায় নতুন ও পুরাতন সব বিজেপি নেতারাই একস্বরে তা

মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গা কংগ্রেসের গলার কাঁটা হিসাবে বিঁধে আছে। নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তও তাদের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় বেলায় কেন্দ্র সরকার জাঠেদের সংরক্ষণ দিয়ে নিজেদের রাস্তায় নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে ফেলল।

সমর্থন করেন। সবচেয়ে বড় কথা যে, এই প্রদেশে এবার মুসলমান ভোট যেভাবে ভাগ হবে তা আগে কখনো হয়নি। মনে হচ্ছে কংগ্রেস কেবল ধরাশায়ী হবে না, মরণাপন্ন অবস্থায় চলে যাবে।

মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গা কংগ্রেসের গলার কাঁটা হিসাবে বিঁধে আছে। নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তও তাদের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় বেলায় কেন্দ্র সরকার জাঠেদের সংরক্ষণ দিয়ে নিজেদের রাস্তায় নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে ফেলল। দেশের মধ্যে পুরনো ও সর্বাধিক সংগঠিত মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে কংগ্রেস এত জঘন্যভাবে রাগিয়ে দিয়েছে যে এখন তাদের তোয়াজ করে আর কাজ চলছে না। আবার তাদের থেকে মুখ ফিরিয়েও নিতে পারছে না। যাদের খুশি করার জন্য এই ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে তারাও কি তাদের সঙ্গে থাকবে? ভোটের অঙ্কের হিসাবেও দেখা যায় তো মুসলমান ভোটই বেশি। এজন্য কংগ্রেস এখন নিজেকে ঠকে যাওয়ার মতো অনুভব করছে। মুসলমান ভোট সংগঠিত হয়ে কোনো একপক্ষকে ভোট দেবে না, কিন্তু তাদের ভোট বিভাজনই কংগ্রেসের হারের সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটা বিজেপি'র পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। মুজফ্‌ফরনগর-সহ পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ২৮ শতাংশ মুসলমান সমাজবাদীপার্টির প্রতি খুবই খাপ্পা। এখন তারা সমাজবাদী পার্টির শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত পিতা-পুত্র মুলায়ম-অখিলেশ-কে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিতে রাজি নয়। এই প্রশ্ন শুধু সমাজবাদী পার্টির প্রতি রাগেই সীমিত নয়, বরং মুসলমানদের সামনে এক প্রশ্নচিহ্ন যে ভোট দিলে কাকে দেবে? সমাজবাদী পার্টি দাঙ্গা করিয়ে মুসলমানদের কষ্টের মধ্যে ফেলেছে আর কংগ্রেস যাবার সময়ও জাঠেদের সংরক্ষণ দিয়েছে। মুজফ্‌ফরনগরের দাঙ্গার জন্য মুসলমানরা জাঠেদের দায়ী করে। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে মুসলমানরা জাঠেদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেনি। মুসলমানদের কথায়— কংগ্রেস জাঠের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং সংরক্ষণের পুরস্কারে তাদের লাভই করে দিয়েছে। মুসলমানদের মতে এটা তো তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো অবস্থা। এই সিদ্ধান্তের জন্য রশিদ আলভির মতো সাংসদ ও কংগ্রেসের প্রবক্তা দলের বৈঠকে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। আবার দিল্লীর অন্য এক কংগ্রেসী মুসলমান নেতা আসিফ খানও তাঁর দলকে একহাত নিয়েছেন। তাঁর মতে, "মুসলমানদের যারা মেরেছে তাদের সুযোগ- সুবিধা প্রদান করে সরকার প্রমাণ করেছে তাদের সামনে মুসলমান ভোটারদের কোনো অস্তিত্ব নেই।" কিন্তু রসিদ আলভি যে পত্র কংগ্রেস নেতৃত্বকে লিখেছেন তাতে এটা পরিষ্কার যে, কংগ্রেস জাঠেদের সংরক্ষণ দেওয়ার বিরোধী নয়, শুধু সরকার ভুল সময়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা ভোটের প্রাক্কালে জাঠেদের সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টিকে মুসলমানরা মনে করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমান কোতলকারী জাঠসম্প্রদায়কে পুরস্কৃত করেছে। রসিদ আলভি-সহ অন্য মুসলমান কংগ্রেসী নেতারাও মনে করেন জাঠ সম্প্রদায় খুব সম্পন্ন, তাদের সংরক্ষণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ভোট ও দাঙ্গা যখন দু'টোই হচ্ছে তখন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে কংগ্রেস মুসলমান সমাজকে বার্তা দিল যে তাদের ভোট কংগ্রেসের প্রয়োজন নেই।

কংগ্রেসের বড় নেতাদের মতে ভোটের সময় সংরক্ষণ দেওয়া পার্টির দূরদর্শী মীমাংসা নয়। পারম্পরিক মুসলমান ভোটকে অসন্তুষ্ট করে কংগ্রেস আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু এই সুযোগে সংবাদপত্র এবং সুশীলসমাজ প্রশ্ন তুলেছেন, জাঠেদের সংরক্ষণ দেওয়া কি ভুল? মুসলমানরা তো সংরক্ষণ পাওয়ার জন্য আকাশ-পাতাল এক করে ফেলে ও নানাভাবে সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে। কিন্তু অন্য সমাজকে যখন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তখন মুসলমানদের পেটব্যথা কেন শুরু হয়? মুসলমানরা যদি তাদের ভোটব্যাঙ্কের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতাসীন দলকে ব্ল্যাকমেল করতে চায় তো সেটা তাদের মারাত্মক ভুল নীতি। দাঙ্গা হওয়া এক কথা আর জাঠেদের সংরক্ষণ দেওয়া অন্য কথা। এই দু'টোকে এক করে দেখার অর্থ তাদের দৃষ্টিতেই কি দোষ আছে— মুসলমান নেতারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। তারা নিজেদের কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে পরিচয় দেয়। এবার তাদের বলতে হবে উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর দলের সাফল্য কীভাবে আসছে। মুসলমান নেতাদেরকে মায়াবতীর রাজত্বে কেন বড় বড় পদে আসীন দেখা যাচ্ছে? মুসলমানদের দু'নৌকায় পা দেওয়া ছেড়ে দিতে হবে। তারা মায়াবতী ও মুলায়ম দু'জনকেই ভোট দেয় ও ক্ষমতার মিঠাফল ভোগ করে। যখন কংগ্রেস তাদের ভোটব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্য অন্য কারো হাত ধরে তখন মুসলমানরা তার বিরোধিতা করে। কংগ্রেস দলের অনেক বড় বড় নেতা মুসলমানদের এই দু'নৌকায় পা দেওয়া ও দ্বিচারী মনোভাবের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। বহুজন সমাজবাদীপার্টি উত্তরপ্রদেশে কখনোও মুসলমানদের প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখেনি।

মুজফফরনগর দাঙ্গার ব্যাপারে বসপা'র কোনো ভালো রেকর্ড ছিল না। তাদেরও কিছু নেতার বিরুদ্ধে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ আছে। এ জন্যই এসময়ে মুসলমান ভোট কংগ্রেস, বসপা, সপা-র মধ্যে তিনভাগে ভাগ হতে দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি-কে কেবলমাত্র তারাই আটকাতে পারে। কিন্তু এখানে মুসলমান নেতারাও বসে নেই, তাঁরা নরেন্দ্র মোদীকেই তাদের ভবিষ্যৎরূপে দেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যখন উপরোক্ত তিনটি দলই দাঙ্গা করে আর সব দোষ তারা বিজেপি'র ওপর লাগায়, তাহলে মুসলমানদের একটা অংশ যদি বিজেপি-কে ভোট দেয় তবে তাদের গোঁসা হওয়ার কারণ কি? তাঁদের আরো বক্তব্য, ওই তিনটি দলকে তো অনেকবার ঠিকা দেওয়া হয়েছিল, এবার মোদীকেও দেখা যাক। উত্তরপ্রদেশে এবার মোদীর পক্ষে ওকালতি করতে অনেক মুসলমান নেতা ও সংগঠনকে দেখা যাচ্ছে। মুসলমানদের উন্নতি ও তাদের রক্ষার জন্য সেমিনার ও সভা হচ্ছে। প্রকাশ্যে মুসলমানগোষ্ঠী মোদীর জয়ধ্বনি দিতে মাঠে নেমে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, যাঁকে মুসলমানদের ঘাতক বলা হচ্ছে তাঁর হাতেই তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হবে। যে-কোনো অবস্থাতে তো মরতে হবে, এবার এটা করেই দেখা যাক না। যার ওপর বিশ্বাস করে দায়িত্ব দেওয়া হয় নীতিগত ভাবেই তিনি বিশ্বাসী হয়ে যান। যদি বিজেপি তাঁদের সঙ্গে ভাল ও যথাযথ ব্যবহার করে তো তাঁরাও বিজেপি-কে অবলম্বন করবেন। অনুভব যদি তিক্ত প্রমাণিত হয় তো মুসলমানদের কোনো আপশোস হবে না। মোদীর সমর্থক মুসলমানরা বলেন, আদালত মোদীকে ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস, সপা ও বসপা বলে যে নিম্ন আদালত মোদীকে মুক্তি দিয়েছে, এখনো তো উচ্চ আদালতে মামলা বাকি আছে। এজন্য মোদীর পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক জারি আছে।

সপা, বসপা ও কংগ্রেসের অতিরিক্ত এবার 'আপ' ময়দানে নেমেছে। দেখা যাক তারা কোন গোলাপ ফোটায়। রাহুলের মুখোমুখি হয়ে কুমার বিশ্বাস পরীক্ষায় ফেল করে বসে আছে। কেননা সে নিজের লেখা কবিতায় ইমাম হুসেনকে নিয়ে যে টিপ্পনী কেটেছে তাতে কোনো মুসলমান তার ধারেকাছেও যাবে না। আম আদমি পার্টি উপরোক্ত তিন দলেরই ভোট কাটবে, এজন্য এতে কংগ্রেসেরই লাভ হবে। মোদীর বিরুদ্ধে কেজরিওয়ালের পক্ষে যদি ওই তিনটি দল মোর্চা তৈরি করে নিত তাহলে বিজেপির অবস্থা কিছুটা খারাপ হতে পারতো। এমতাবস্থায় যদি মোদী সফল হোন তো তিনটি দলের ভবিষ্যৎ খারাপ হয়ে যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশের লড়াই প্রতিবারের মতো এবারও কেন্দ্রে স্থাপিত হতে যাওয়া সরকারের রাস্তা প্রশস্ত করবে।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

**** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.**
**** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.**
**** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.**
**** Anti-Termite & Pest Control Treatment**

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com web : www.calcuttawaterproofing.com

বিশেষ নিবন্ধ

ঠাকুরনগর স্থাপনে শ্যামাপ্রসাদ

‘মতুয়া’ সম্প্রদায় গঠনের নেপথ্য ইতিহাস

এন. সি. দে

ভারতীয় বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠীগুলি মূলত মুৎসুদ্দি বেনিয়াদের দখলে। এদের সংস্কৃতিও বেনিয়াবৃত্তিতে ভরপুর। দেশের ঠাকুর ফেলে এরা বিদেশি কুকুরকে কোলে নিয়ে ঘোরে। যা কিছু ভারতীয় তথা হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গ তা তাদের খবরের মর্যাদা পায় না। পরধর্ম, পর মত ভজনা করতেই যত উৎসাহ। হিন্দু ধর্মের মর্যাদা রক্ষা তাদের বিষয় নয়। কোথাও দাঙ্গা হলে যদি হিন্দু নিহত হয়, তাহলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না, অথচ কোনও মুসলমান বা অহিন্দুর মৃত্যু হলে তার নাম স্বমহিমায় প্রচারিত হয়। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল গুজরাতের ঘটনায়। অনেকেরই হয়তো মনে আছে গুজরাতের কুতুবুদ্দিন আনসারির কথা। তার হাত জোড় করা কান্নার ছবি ছেপে সেই সমস্ত সব বাজারি পত্রিকা ব্যবসা করেছিল। কংগ্রেস-সিপিএম সেই ছবি কাঁধে করে বয়ে বেড়িয়েছিল মুসলমান মহল্লায়-মহল্লায়। কিন্তু সবরমতি এক্সপ্রেসের কামরায় যে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের নির্মমভাবে পুড়িয়ে মেরেছিল মুসলমানরা, তাদের মধ্যে কেউ কী হাতজোড় করে কাঁদেনি? তাদের কথা এইসকল বাজারি পত্রিকাগুলিতে কেন প্রকাশিত হল না? কিন্তু ‘ধর্মের কল বাতাসে নড়ে’। কেউ নাড়াক কী না নাড়াক। গত মাসে গুজরাতের মেট্রোপলিটান কোর্টের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এ. ওয়াই. ভাকানি (A.Y.Vakani) তার রায়ে জানিয়েছিল যে ঐ ছবিটি যে কুতুবদ্দিনের তা সে প্রমাণ করতে পারেনি। সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না। কেউ তাকে প্রমাণ করতে বলেনি। কিন্তু সে নিজেই মুম্বাইয়ের হিন্দী ছবি ‘রাজধানী এক্সপ্রেস- এর’ নির্মাতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিল। তার ঐ ছবি ব্যবহারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দাবিও করেছিল। তাতেই তার

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর

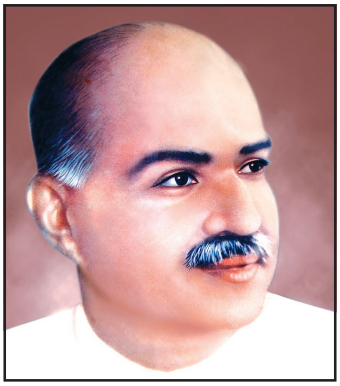

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অতীতের চালাকি ধরা পড়ে গেছে। আদালতে সে প্রমাণই করতে পারেনি যে ওটা তারই ছবি।

এটা আজকের বিষয় নয়। আজকের বিষয় মতুয়া সম্প্রদায়। মতুয়ারা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অত্যন্ত সংগঠিত লড়াকু-গোষ্ঠী। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় এদের প্রকৃত ইতিহাস আড়ালেই রাখতে চায় এই বিদেশী পদানত পত্রিকা গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু যেহেতু নির্বাচনে এরা নির্ণায়ক শক্তি তাই এদের কদর হঠাৎ বাড়ছে। এদের সংগঠনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভূমিকে মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা। তাইতো এদের প্রতীক লাঠি, কাঁসি, শিঙা, জয়ডঙ্কা আর লাল নিশান। কিন্তু মুসলমান প্রতিরোধের ইতিহাস তো আর মুৎসুদ্দি পত্রিকাগোষ্ঠী ছাপতে পারে না। তাহলে যে তাদের প্রভুরা রেগে যাবে। তাহলে তো ব্যবসা জমবে না।

ডঃ কালিদাস বৈদ্য, বর্তমানে এক অশীতিপর বৃদ্ধ (বেঁচে আছেন কিনা জানিনা) সারা জীবন পূর্ববঙ্গের/পূর্ব পাকিস্তানের, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় বহু প্রথিতযশা ব্যক্তির সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। তিনি সারা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন তাঁর লেখা একটি বইয়ে। বইটির নাম ‘বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালের শেখ মুজিব’। এই বইটিতেই ডাঃ বৈদ্য শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মতুয়া সংঘের সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সেই প্রয়াসকে প্রলম্বিত করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি যদি আজ জীবিত থাকেন, তাহলে আমার প্রার্থনা তিনি নিশ্চয়ই আরো তথ্য জনগণের সামনে আনুন। আজ মতুয়াদের নিয়ে যারা মাতামাতি করছেন, তাঁরা মূলত হিন্দু-বিদ্বেষী রাজনৈতিক দল, হিন্দু সম্প্রদায়কে অবহেলা, অবজ্ঞা করে অসংগঠিত করে রাখাটাই যাদের কাজ, যা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের স্বপ্নের ঠিক বিপরীত।

ডঃ বৈদ্য তার আজীবন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে নমঃ সমাজ ছিল স্বাধীনচিত্ত, বীর, সাহসী ও শক্তিবাদে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্ম বা হিন্দু সমাজের উপর সামান্যতম আক্রমণ হলেই নমঃ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে, বীরদর্পে অস্ত্রহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে যুগে তারাই ছিল পূর্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার একমাত্র সদাজাগ্রত প্রহরী। এই সামাজিক দায়িত্ব তাদের জন্মগত ঐতিহ্য ও শিক্ষার ফল। এই কারণে ইংরেজ ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ জন হান্টার নমঃ সম্প্রদায়কে ‘মার্শাল কম্যুনিটি

অব বেঙ্গল'— 'বাংলার যোদ্ধা শ্রেণী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এদের জন্যই মুসলমানরা হিন্দু গ্রামে আক্রমণ করতে ভয় পেতো।

নমঃ সম্প্রদায়কে প্রথম সংগঠিত করেছিলেন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সাফলীডাঙ্গা গ্রামে বাংলা ১২১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৮৪-তে স্বর্গগত হন। পরে ওড়াকান্দি গ্রামেই তিনি বসবাস শুরু করেন এবং সেটাই তাঁর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে পড়তেন বলেই তাঁর শিষ্যদের বলা হত 'মতুয়া'। এরা কোনও আলাদা ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়; বরং এরা হিন্দু সম্প্রদায়েরই একটি অংশ। তবে অত্যন্ত সংগঠিত গুরুগত প্রাণ এই গোষ্ঠী। তার একটি প্রমাণ পদ্মবিলা গ্রামের ঘটনা।

''সেটা ১৯২৩ সালের ঘটনা। ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামের কাছেই পদ্মবিল নামে একটি বিল ছিল। তার পাশের গ্রামের নাম ছিল পদ্মবিলা। সেই গ্রামে শুধু হিন্দুরাই বসবাস করত। পাশের গ্রামে ছিল মুসলমানদের বাস। ঘটনার সূত্রপাত হয় বিলের মাছ ধরা নিয়ে কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমানের কথা কাটাকাটির মধ্যে দিয়ে। পরে তা মারামারির রূপ নেয় এবং মুসলমানরাই বেশি মার খায়। ফলে পরের দিন তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণের পরিকল্পনা করে এবং প্রস্তুতি নেয়।

এই খবর শুনে ওড়াকান্দির শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরের দিন খবর এল যে কাজিয়া করার জন্য মুসলমানরা প্রচুর সংখ্যায় বিলের কাছে জমা হয়েছে এবং যে কোনো সময় তারা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। সেদিন ছিল মতুয়া ধর্মমতের প্রবর্তক শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন। ঐদিন ওড়াকান্দির বারুণীর স্নান ও মেলা বসত। কাজেই মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু সেদিন ওড়াকান্দিতে জমা হয়েছিল। ঠাকুরের আদেশ পেয়েই সেদিন হাজার হাজার মতুয়া রণহুঙ্কারে ওড়াকান্দির আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।' মুসলমানরা 'আল্লাহ্ আকবর' বলে আক্রমণ করতেই মতুয়ারা 'জয় মা কালী' বলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের প্রত্যাঘাতে সেদিন বহু মুসলমান মারা গিয়েছিল। সেদিন যেসব হিন্দু বীরেরা ঠাকুরের কাছে হিন্দুদের সুরক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন, ঠাকুর তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি করে লাঠি। আর বলেছিলেন— ''এই লাঠি এতকাল হিন্দুদের রক্ষা করেছে। আজও তা হিন্দুদের রক্ষা করবে।'' আরো বলেছিলেন, ''আজ থেকে এই ডঙ্কার নাম হল জয়ডঙ্গা।'' আজকের মতুয়ারা সে লাঠি, শিঙা, জয়ডঙ্কা, নিশান নিয়ে মিছিল করে তার পিছনে রয়েছে এই গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনা—এটা ভুলে শুধু উৎসবে মাতালে চলবে না।

বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি যোগেন মণ্ডলকে ডেকে বললেন, পূর্ব বাংলার নমঃ সমাজ যদি পাকিস্তানের বিরোধিতা করে তবে পাকিস্তান হবার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।'' এর পর থেকেই শুরু এক ঘৃণ্য, বিয়োগান্ত নাটক। যোগেন মণ্ডল বাংলায় আর নমঃ সমাজের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনতে শুরু করলেন। যোগেন মণ্ডল সভা করে করে বলতে লাগলেন, ''তফসিলি সমাজ ও মুসলমান সমাজের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বর্ধিষ্ণু হিন্দুরাও এতকাল ধরে তফসিলিদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তারা মুসলমানদের উপরও সমান অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচারের হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাবার জন্যই তফসিলিদের পাকিস্তান চাইতে হবে।'' এই ভাবেই শুরু হল হিন্দু সমাজের মধ্যে ফাটল। লাভ হল মুসলমানদের, জয় হল ইংরেজ ষড়যন্ত্রের।

কিন্তু এইসময় শ্রীশ্রী গুরুচাঁদের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছিল গোটা হিন্দুসমাজে। তিনি বুঝেছিলেন, রাষ্ট্রশক্তি হাতে না থাকলে একটি জাতি বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। তাই তিনি ঘোষণা করলেন—'যে জাতির নাই রাজা, সে জাতি নয় তাজা। যার দল নাই, তার বল নাই'। এরপর যা হবার তাই হল। পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব পাকিস্তান। মুসলমান হল রাজা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের হাত থেকে যিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ। তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি তাকে রক্ষা করারও ব্যবস্থা করে যান। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নমঃ সম্প্রদায় হল মার্শাল সম্প্রদায়, তাদের সীমান্তে বসাতে পারলে সীমান্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। তিনি ঘোষণা করলেন, পূর্ববাংলা থেকে যেসব নমঃ পরিবার আসবে প্রতিটি পরিবারকে ৪/৫ কাঠা জমির উপর একখানি চালাঘর, এক জোড়া বলদ ও একখানা লাঙল দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্যই শ্যামাপ্রসাদ গুরুচাঁদের নাতি প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (পি. আর. ঠাকুর)-কে 'ঠাকুরনগর' নামে এক নয়া বসতি স্থাপন করতে সবরকম সহযোগিতা করেন। এই উদ্দেশ্যে শত শত বিঘা জমি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে বসতি করতে ইচ্ছুক এরকম পরিবারদের মধ্যে সেই জমি বিলি করেছিলেন। কিছুটা জমিতে নিজে বাড়ি করে বাস করতে লাগলেন। তখন এইসব অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। এই প্রমথরঞ্জন ছিলেন একজন ব্যারিস্টার। ইতিই আজকের আধুনিক ঠাকুরনগরের স্থপতি। তিনি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে রাজনীতিতে আসেন। ১৯২৭ সালে এম.এল.এ হন। ১৯৬২-তে বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় তফসিলি উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রীও হন। ১৯৬৭-তে নবদ্বীপ থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের কংগ্রেসীদের সঙ্গে তাঁর মেলেনি। তাই রাজনীতি ত্যাগ করেছিলেন।

এমনই একজন সুযোগ্য পুত্রের স্ত্রী (যাকে সকলে বড়-মা ডাকেন) তিনি কংগ্রেস-জাত একটি দলের হাতে চলে গেলেন, যারা আজ হিন্দধর্মের মধ্যে বিভেদ আনছে—সবসময় দাঙ্গা আর দেশভাগের জন্য হিন্দুদেরই দোষারোপ করে। অঞ্চলের জনগণ কিন্তু বলছেন, ঠাকুরনগরের জন্য নয়, ঠাকুর পরিবারের উন্নতিতে মেতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঠাকুর বাড়িকে আজ তারা গ্রাস করে নিয়েছে। আর এক মতুয়া 'মতুয়া মহাসভার সেন্ট্রাল কমিটি'র সদস্য কৃষ্ণদাস বিশ্বাস এবার বিজেপি-র প্রার্থী বনগাঁ থেকে। তিনি দাবি তুলেছেন, কেন শুধু একটি পরিবার থেকে হবেন এম. পি., মন্ত্রী, পঞ্চায়েত সদস্য এবং সব সম্পত্তির অধিকারী। এটা কী ভারত সেবাশ্রম সংঘের মত সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে না?

জনগণ কী চান নির্বাচনের ফলেই বোঝা যাবে?

কুফরি মতকেই সমর্থন দিলেন দিল্লী-কলকাতার ইমাম?

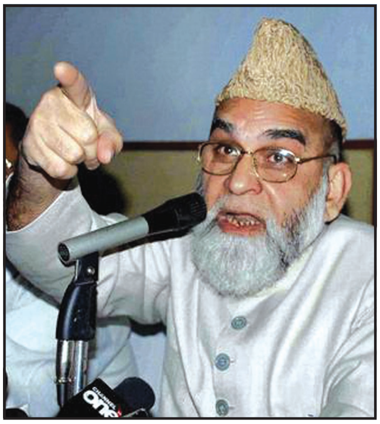

ফতোয়া দিচ্ছেন ইমাম বুখারি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ ভারতে ১৬তম লোকসভার নির্বাচন চলছে। একের পর এক জরিপের ফলে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-র জনপ্রিয়তা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। নরেন্দ্র মোদী ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এটা নিশ্চিত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কয়েক মাস ধরে ভাসছে ভারতের নির্বাচন। সংবাদপত্রে প্রতিদিনই বড়ো অংশ জুড়ে খবর ও কলামে নির্বাচন। প্রশ্ন আসছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক কি শীতল হয়ে পড়বে? কংগ্রেস-আওয়ামি লিগ সম্পর্ক দু'দেশের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। বিজেপি কি এ সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে? এ কয়েকদিনে বাংলাদেশের রাজনীতিকরাও নিশ্চিত হয়েছেন যে, কংগ্রেসের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। সোনিয়া-রাহুলের আক্রমণাত্মক প্রচার সাধারণ মানুষ নিচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন ধরে মোদীর নেতিবাচক খবরগুলো প্রাধান্য পেয়ে এলেও ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষও আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা দৈনিক 'প্রথম আলো'তে পাঠকের কলামে এক নাগরিক প্রশ্ন রেখেছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী-র আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক কি খারাপ ছিল? দু'দেশের মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল তো ওই আমলেই শুরু হয়েছিল। প্রসারিত হয়েছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। অন্য কাগজে আরেকজন পাঠক লিখেছেন, ২০০১ সালে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যখন বিএনপি-জামায়াতের হামলার শিকার হচ্ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কলম্বোয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন, ''এই হামলা বন্ধ করুন। এর গুরুতর প্রভাব ভারতেও পড়তে পারে। আমরা উদ্বিগ্ন।'' খালেদা তড়িঘড়ি দেশে ছুটে এসে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিকরা, ডান-বাম নির্বিশেষে, ভারতের নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে মনে হয় এবার নতুন হিসেবে মেলাতে সতর্কভাবে এগুতো চেষ্টা করছেন। মাসখানেক আগেও যেখানে অনেকের খোলামেলা বক্তব্যে গোধরাকাণ্ড সহজে উচ্চারিত হচ্ছিল, এখন কিছু থেমেছে। যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের যোগাযোগ বেশি, কয়েকদিন ধরে খবর আসছে নানা সূত্রে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভোট এবার বাড়ছে। এবং ব্যাপকভাবে। বেশ কিছু আসনে প্রতিযোগিতায় থাকছেন বিজেপি প্রার্থী। ঘাম ছুটছে মমতার।

পশ্চিমবঙ্গে অনেক আত্মীয় রয়েছেন কিংবা পরিবারের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরাবাসী, এমন হিন্দু পরিবারগুলো জানালেন, দিল্লীর জামা মসজিদের ইমামের সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর বৈঠকের পর ইমাম ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছেন মুসলমানদের প্রতি তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে। একই আহ্বান জানিয়েছেন কলকাতায় টিপু সুলতান মসজিদের ইমামও। স্বাভাবিকভাবে এপার বাংলা, ওপার বাংলায় আলোচনা হচ্ছে,

বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কুফরি (ইসলাম পরিপন্থী) মতবাদ মনে করে ইসলামি আলেম সমাজ ও দলগুলো। বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ভোট দেওয়া না-জায়েজ। সেখানে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ভোটদানের আহ্বান জানিয়ে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম এবং কলকাতায় টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সেই কুফরি মতকেই সমর্থন দিলেন। বাংলাদেশে মুসলমানরা ইসলামি সংবিধান ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার জন্য জান কোরবান, পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র আর ভারতে মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে থাকার জন্যে বলা হচ্ছে।

কি বিচিত্র ধর্মীয় ফতোয়া! বাংলাদেশে যারা তালেবানি রাষ্ট্র গড়তে চায়, পশ্চিমবঙ্গে সেই আদর্শের সৈনিকরা মমতার পাশে। ভোটের রাজনীতিতে ফতোয়া পরিবর্তিত হয়ে এভাবেই ধর্মের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে কয়েকজন ইসলামি আলেমের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ভোটদানের এই আহ্বান ইসলামসম্মত কিনা। যদি তাই হয়, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেন সংবিধান থেকে খারিজ করা হয়েছিল ইসলামি নেতাদের তুষ্ট করতে? জবাব মেলেনি। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ভোট দেওয়ায় হিন্দুদের ওপর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামিসহ ইসলামি দলগুলো প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই হামলা চালিয়েছে। মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর ও দোকানপাট গুঁড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করেছে। এ সম্পর্কে দিল্লীর ইমাম ও কলকাতার ইমামের বক্তব্য শুনতে পারলে ভালো হতো, এমনটাই মনে করছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা। এটাও শুনতে চায়, তাদের বক্তব্য সঠিক হলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ইসলামি নেতা ও আলেমদের বক্তব্য মিথ্যা কিনা? অথবা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আলেম ও ইসলামি নেতাদের বক্তব্য সঠিক হলে দিল্লী-কলকাতার ইমামদের বক্তব্য ইসলামবিরোধী কিনা?

প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য ও হিন্দু দর্শনের চর্চা

অমলেশ মিশ্র

যাঁরা বলেন, 'সব ধর্মই এক'—তাঁরা কী ভেবে বা কী অর্থে বলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায় না। হয়তো তাঁরা বলতে চান যে, ঈশ্বর এক এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাকে বিভিন্ন নামে উপাসনা করে মাত্র। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি যথাযোগ্য মনে হয় না। কারণ (১) সব ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। নিরীশ্বরবাদীধর্ম আছে এবং তা বেশ শক্তিশালী, (২) যে সব ধর্মে ঈশ্বরের কথা স্বীকার করা হয়েছে সেইসব ধর্মের ঈশ্বরের চরিত্র একরকম নয়। ঈশ্বরের কল্পনায় সঙ্গে সঙ্গে তাতে কিছু গুণ আরোপ করেছে। সেই গুণসমূহকে আমি চরিত্র বলতে চাইছি। আমরা জানি, কোন কোন ঈশ্বর প্রতিহিংসাপরায়ণ। কোন কোন ঈশ্বর মানুষকে জন্ম থেকেই পাপী ভাবেন, কোন কোন ঈশ্বর বলেন তিনিই একমাত্র ঠিক ঈশ্বর, অন্য ঈশ্বররা দুনম্বরী, কোন কোন ঈশ্বর বলেন, আমার শরণ নিলেই তোমার মুক্তি, অন্য কারুর শরণ নিলে তোমার নরকে স্থান ইত্যাদি।

প্রথমত ধর্ম এবং রিলিজিয়ন সমার্থক নয়। তবু প্রচলিত অর্থে আমরা সবগুলিকে ধর্ম বলি। তা ধরে নিয়েই দেখছি—ঈশ্বরবিহীন ধর্ম আছে, ঈশ্বর যুক্ত ধর্ম আছে, ঈশ্বরদের প্রকৃতি বা চরিত্র একরকম নয়। তাহলে 'সব ধর্মই এক' হয় কী করে।

কোনো কোনো ধর্মে বলা হয় যে ঈশ্বরই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আবার কোনো কোনো ধর্ম এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসই করে না। সব ধর্মই বলে—ভাল হতে, সত্য কথা বলতে ইত্যাদি। আবার এই সত্যের সংজ্ঞাও সব ধর্মে এক নয়। ভালো করে থাকতে বললে যে 'ভালো' বোঝায়, সেই ভালো' আবার বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। আরও বড় কথা হল—সত্য কথা বলা বা ভালোভাবে চলা—এর জন্য কোনো ধর্মতত্ত্বের আবশ্যকও হয়না। (৩) কোনো কোনো ধর্ম কর্মফলবাদের কথা বলে, কোনো কোনো ধর্ম পুনর্জন্মের কথা বলে। (৪) কোনো কোনো ধর্ম 'মোক্ষ'র কথা বলে আবার কোনো কোনো ধর্ম পাপ থেকে মুক্তি, স্বর্গ অথবা নরকে গমনের কথা বলে।

এই ধরনের এত মৌলিক বিভিন্নতা আছে যে, 'সব ধর্মই এক' এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। স্থান বিশেষে যেমন পোশাকে ও খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতা দেখা যায়, স্থান বিশেষে ধর্মেরও বিভিন্নতা বিদ্যমান। কেউ বলেছেন, পোশাক বিভিন্ন হলেও পোশাক পোশাকই, খাদ্যের বিভিন্নতা যতই থাক খাদ্য খাদ্যই। অতএব, বিভিন্নতা থাকলেও পোশাক যেমন পোশাকই, একইভাবে বিভিন্নতা থাকলেও ঈশ্বর একই। কিন্তু এই যুক্তিও সিদ্ধ যুক্তি নয়। কারণ পোশাকের চরিত্র একটাই যে সে দেহ আবরণ করে, খাদ্যের চরিত্র হল যে সে ক্ষুধা মেটায়। কিন্তু ঈশ্বরের এমন কোন সাধারণ চরিত্রের তো হদিশ পাওয়া যায় না। আবার সব ধর্মে ঈশ্বর বিশ্বাসও আবশ্যিক নয়। ঈশ্বর যুক্ত ধর্মের যেমন অনেক অনুগামী আছেন, ঈশ্বর বিযুক্ত ধর্মেরও অনুগামী সংখ্যা কম নয়।

অতএব 'সব ধর্মই এক' কথাটা একান্তভাবে অপরিণত সিদ্ধান্ত—যা যুক্তিযুক্ত নয়। আবার এই স্লোগান কেবলমাত্র হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষেই চালু। অন্য কোনো দেশ বা অন্য কোনো ধর্ম একথা মানেনা। মানেনা বলেই ধর্মান্তরকরণ হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ এবং হিন্দু ধর্মের দেশ। হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক-কে দেখা। একান্ত ঈশ্বর নির্ভর ধর্মতত্ত্ব যেমন এই দেশে উদ্ভব হয়েছে তেমনি একান্তভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও অনস্তিত্বের ধর্মও ভারতবর্ষে উদ্ভূত। এই ধরনের ব্যবস্থা আমরা আর যে সব রিলিজিয়ন (Religion)-কে ধর্ম বলি, সেই সব ধর্মের মধ্যে নেই।

তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সারা বিশ্বে একমাত্র হিন্দুধর্মই অসাম্প্রদায়িক এবং সেই সূত্রে হিন্দুমাত্রেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের। 'হিন্দু মৌলবাদ' এবং 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' নামে যেসব শব্দ-বন্ধ রাজনীতি ও সংবাদ মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়, সেগুলি কল্পনাপ্রসূত নিরর্থক শব্দ মাত্র। অথচ এগুলি ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহার করা হয় হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দু বিরোধিতাকে আড়াল করার জন্য। যেহেতু এদেশের রাজনীতি এবং সংবাদমাধ্যমে সেমেটিক প্রভাবই প্রধান, সেহেতু এই সব শব্দ ব্যবহৃত হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

বর্তমান ভারতে (১৯৪৭ থেকে অদ্যাবধি) যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালক এবং যাঁরা এই শক্তির বিরোধী বলে প্রচলিত, উভয়কেই একই ধরনের হিন্দুবিদ্বেষী দেশের প্রধানশক্তি হিন্দুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কারণে ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে এবং ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। আমরা তার পরিণামে দেখতে পাচ্ছি—বেকারত্ব, সর্বোচ্চ আয় ও সর্ব নিম্ন আয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, মাথাকিছু আয় উন্নত জীবনযাত্রার অনুকূল নয়, দেশের টাকা গোপনে বিদেশে জমা হচ্ছে। রাজনীতিতে তাঁরাই প্রাধান্য করছেন যাদের আধ্যাত্মিকতা প্রায় নাই।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধ, ব্যাপক দুর্নীতি, ধান্দাবাজি, দেশের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ, ধর্ম- অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি—অর্থ এবং কাম পুরুষার্থের সাধনা, ভারতীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে সরকারি নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও মানুষের জীবন যাত্রার কোন সম্পর্ক নাই। দেশ যে কোন দিশায় চলেছে—তা কেউ বলতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের নেতৃত্বে আসতে হবে দেশকে বাঁচানোর জন্য। হিন্দু বিদ্বেষ নিয়ে শাসনব্যবস্থা চালাতে গিয়ে এই দুরবস্থায় পতিত হওয়া গেছে। হিন্দুদের মধ্যে সব দর্শনের আদর্শ, শিক্ষা ও পরম্পরা আছে। তাকে প্রয়োগ করতে হবে রাজশক্তির ব্যবহারে। জাতীয় উন্নতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হিন্দু ঐক্য। হিন্দু দর্শনের চর্চা—একাত্ম মানববাদ।

‘সেভ এভরি ড্রপ’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা পৃথিবীর সমস্ত শহর ও গ্রামের দেওয়ালে ও পানীয় জল নেওয়ার স্থানে ‘জলই জীবন’ লেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লেখা কি মানুষের মনে প্রভাব ফেলছে? এর দ্বারা কি মানুষ আগামী দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা ভেবে সচেতন হচ্ছে? মনে হয় ‘না’। ১৯৯৪ সালে নেদারল্যান্ডে ‘পানীয় জল ও পরিবেশ স্বচ্ছতা’-র বিষয়ে সারা পৃথিবীর এক একজন মন্ত্রীকে নিয়ে সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে পানীয় জলের অপচয় রোধ নিয়ে অনেক বড় বড় কথা হয়েছিল। কিন্তু তার ২০ বছর পরেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আসল কথা হলো, আমরা ব্যবহারের জন্য যতটুকু জল পাই তার কি সঠিক উপযোগ করি? জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য আমরা কি সতত সচেষ্ট থাকি? এরও উত্তর চোখ খোলা রাখলেই পাওয়া যাবে। রাস্তার নলগুলির বেশির ভাগই কলশূন্য। অনবরত জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জলের জন্যই বিশাল লাইন। ঝগড়াঝাটি, মারামারি লেগেই আছে। এছাড়াও গৃহস্থবাড়িতে, বড় বড় আবাসনগুলিতে তো অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েই যাচ্ছে। হিসাবটা যদি এভাবে করা যায়— সারাদিন কত বালতি, মাসে কত বালতি, বছরে কত বালতি জল শুধু ড্রেন দিয়ে বহে যাচ্ছে। এর হিসাব আমরা না রাখলেও কেউ রাখেন। ফোঁটা ফোঁটা জল বাঁচানোর জন্য তিনি যখন চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন লোকেরা হাসাহাসি করছেন। জলের জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে এটা সরকার বা সাধারণ লোক কেউই বুঝতে পারছেন না। সেজন্যই আবিদ সুরতির মতো প্রখ্যাত শিল্পী ফোঁটা ফোঁটা জল বাঁচানোর জন্য দরজায় দরজায় ঘুরছেন। ডেকে ডেকে বলেছেন— কল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে নষ্ট হচ্ছে না তো? লোকেরা মুখে কাপড়চাপা দিয়ে হাসবেই, কেননা আমরা জল সংরক্ষণ ব্যাপারটা কখনোই ঠিকভাবে বুঝিনি। জল নষ্ট হওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু আবিদ সুরতি হাসি-ঠাট্টার কোনো পরোয়া করেন না।

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কার্টুনিস্ট হিসাবে তাঁকে দেশের কোটি কোটি লোকেরা জানেন। কিন্তু এখন ‘জলরক্ষক’ নামেই বেশি পরিচিত। আবিদ সুরতি শুধুমাত্র আশা করেই বেঁচে নেই; মানুষের আশা জাগাতে ও পথ দেখাতেও পারেন। পরিবেশ জগতে এখন তিনি অতি পরিচিত একটি নাম। জল অপচয় রোধ করতে তিনি ‘সেভ এভরি ড্রপ’ অর্থাৎ এক ফোঁটা জলও বাঁচাও বা একবিন্দু জলও নষ্ট হতে দিও

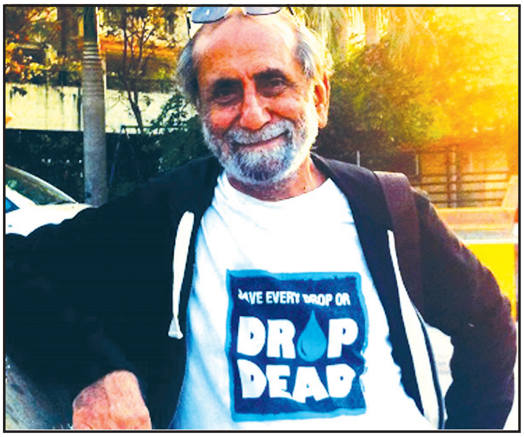

আবিদ সুরতি

না-র দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁকে প্রতি রবিবার সকালে মুম্বাই-এর কোনো না কোনো আবাসনে দেখা যাবে। সেই আবাসনের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল বাজান ও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া প্লাম্বারকে দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া বন্ধ করার কাজে লেগে যান। প্রায়ই ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা টিপ্পনি কাটেন— কয়েক ফোঁটা জল পড়ে গেলে কি আর হবে? তখন আবিদ সুরতি ফোঁটা ফোঁটা জলের পুরো হিসাব দিয়ে জানান কত জল নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্নকর্তা অবাক হয়ে যান— এত জল নষ্ট হচ্ছে! তাঁর হিসাব— কোনো নল থেকে এক সেকেন্ডে এক ফোঁটা জল পড়ে তো মাসে এক হাজার লিটার জল নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত প্রতি ঘরে এরকম দু’ একটা কল থাকে যা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তেই থাকে।

আবিদ সুরতি ২০০৭ সালে ‘সেভ এভরি ড্রপ’ আন্দোলনের সূচনা করেন। তখন ওয়ান ম্যান এনজিও ছিল। আজ সারা দেশে তাঁর থেকে প্রেরণা পেয়ে শত শত লোক বিভিন্ন প্রদেশে এই আন্দোলন চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, “এই কাজ যে কেউ যে কোনো স্থানেই করতে পারেন।” বস্তুত তিনি মুম্বাইয়ে জলের জন্য লোকের রাত থেকে লাইন দেওয়া, ঝগড়া, মারামারি করা দেখে বালক বয়সেই তাঁর ধারণা হয়, যে জল নষ্ট হয় তা বাঁচাতে পারলে অনেক লাভ হবে। পরে বড় হয়ে তিনি রাজস্থানে জলের জন্য মানুষের হাহাকার দেখেছেন। তাঁর কথায়— এত জলকষ্ট তবু জল বাঁচানোর জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে।”

আশার কথা, তাঁর পরিশ্রমের ফলে লোকের একটু একটু করে চেতনা জাগছে। তিনি কারো কল ঠিক করে দেওয়ার জন্য পয়সা নেন না। নিজের পয়সায় প্রচারপত্র বিলি করেন। বই লিখে ও ছবি এঁকে যে পয়সা তিনি পান তা থেকেই এই খরচ করেন।

আবিদ সুরতি এখন দেশের সব গ্রাম ও শহরেই এই আন্দোলন চালাবার জন্য তৈরি। তাঁর প্রশ্ন— রাস্তার কল ঠিক করার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু নিজের ঘরের কল ঠিক রাখার দায়িত্ব তো আপনার নিজের। কলকাতাবাসীর প্রতি সাবধাবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, “কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার ভূগর্ভে প্রতিদিন ২০ কোটি ৪০ লক্ষ লিটার জল জমা হয়। তোলা হয় ৩০ কোটি ৫ লক্ষ লিটারেরও বেশি। প্রতিদিন জল নষ্ট হওয়ার কারণে জমা-খরচের ফারাকটা বাড়ছে। ১০-১৫ বছরের মধ্যে তীব্র জলসঙ্কটে পড়বে কলকাতা। শুধু তাই নয়, জল সরবরাহে টান পড়বে, জলে বিষাক্ত ধাতু মিশবে, জলের স্বাদ বদলে যাবে, আর্সেনিক উঠে আসবে, দ্রবীভূত লবণ ও লোহার পরিমাণ বাড়বে।”

আমেরিকা ও ইউরোপ আবিদ সুরতির জল আন্দোলন নিয়ে ডক্যুমেন্টরি তৈরি করে দেখিয়ে তাদের দেশের মানুষকে সচেতন করতে পেরেছে। তাঁর চিন্তা ভারত কবে সচেতন হবে?

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

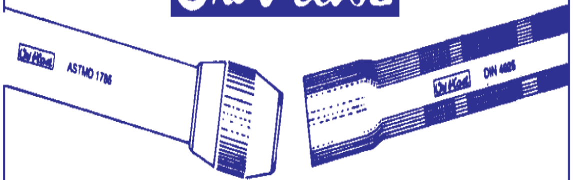

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

“কখনও কখনও এমন ঘটতে দেখা যায় যে, মানুষ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়েই শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে পারে। স্বীয় ‘বাণী’ বা ‘ভাব’ ব্যক্ত করার পর মহান ব্যক্তিগণকে কর্মক্ষেত্র থেকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। কারণ, শিশু, শিক্ষার্থী বা শিষ্য যথার্থ স্বাধীনতা পেলে তবেই নিজ অভিজ্ঞতা বাস্তবে পরিণত করতে পারে।”

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

কৈফিয়ত দিতে হবে গান্ধী পরিবারকে

কেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের এই দশা করলেন

স্বপন দাশগুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রাক্তন প্রচার উপদেষ্টা সঞ্জয় বারুর সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি সোনিয়া নিয়ন্ত্রিত দেশের শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছে। লোকের মোটামুটি আন্দাজ থাকলেও একেবারে নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নিয়োগও যে তাঁরই (সোনিয়ার) খেয়ালখুশিতে হোত তা বারু খুল্লামখুল্লা করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই বারুই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত নিজের পচ্ছন্দসই কয়েকজন আমলাদের অন্যতম। মজার বিষয়, আরও অনেক দিল্লীবাসী কেষ্টবিষ্টুর মতো বারুরও হয়ত দৃঢ় ধারণা যে ভারতবর্ষ দিল্লীতে শুরু হয়ে দিল্লীর সীমানার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কেননা তিনি বইটি প্রকাশ করেছেন ১১ এপ্রিল ঠিক দিল্লীর নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দিন। আমি বারুকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় উনি বলেছিলেন এর আগে প্রকাশ করলে দিল্লীর নির্বাচনে ভীষণ ধাক্কা লাগতো। কংগ্রেসের প্রত্যাশীরা মার খেয়ে যেতে পারতেন, অর্থাৎ তাঁর ধারণায় হয়ত-বা দিল্লীর বাইরে এই বইয়ের অভিঘাত সেরকম তীব্র নাও হতে পারে।

যাই হোক, এই ধরনের ভদ্র ভণ্ডামি বরদাস্ত করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের বর্তমান প্রচার কাজকর্ম দেখার ভারপ্রাপ্তের কাছ থেকে যে কৈফিয়ত নেওয়া হচ্ছে সেটি সারবত্তাহীন শুধু নয়—নিতান্তই হাস্যকর। মনমোহন সিং নাকি এই বই প্রকাশের পর স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, ভীষণ রকম মর্মাহতও। দপ্তরের অভিযোগ বইটির লেখক শুধুই

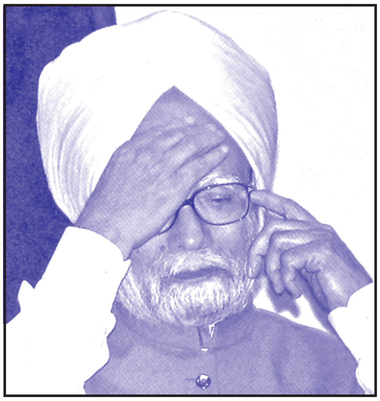

পয়সা-কড়ি রোজগারের আশায় নিজের বিশেষ সম্মানীয় পদমর্যাদার অপপ্রয়োগ করেছেন। কথাগুলি খুবই কঠিন এবং লেখক বারুর পক্ষে অবশ্যই চূড়ান্ত অবমাননাকর হোত, যদি না গোটা দিল্লীর সংশ্লিষ্ট মহল না জানত যে বারুই ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সব থেকে গ্রহণীয় ও ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিত্ব। মনে রাখতে হবে আজও প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর অধিকাংশ ভাষণই বারুই লেখেন, সেখানে কোনো নিরাপত্তা আধিকারিককে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দেন না বা তাঁরা লিখতেও চান না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বারু বইটি লেখা শেষ করেছিলেন মাস পাঁচেক আগে। তাই এটা বিশ্বাস করা নিতান্তই কঠিন যে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) এর আগাম কপি (advance copy) পাননি। বারু যে ব্যক্তিগত স্বার্থে মনমোহন বা কংগ্রেস-বিরোধী নন তার কিছুটা প্রমাণ অবশ্যই রয়েছে দিল্লীর নির্বাচনের আগে বইটি না প্রকাশ করায়।

বইটির তথ্য সমাহার না উপন্যাস?

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয়েছে বইটি আদতে গপ্পোকথাগন্ধী। ঠিকই, বইটি যখন লেখা হয়েছে তখনও নির্বাচনের ঢের দেরি ছিল আর মনমোহন যে রেসকোর্স রোডের ঠিকানা ছেড়ে দিয়ে মোতিলাল নেহরু মার্গে যাওয়া মনস্থ করেছেন তারও কোনো আভাস বইটিতে নেই। শুধু তাই নয়, এটা যে বাস্তবধর্মী উপন্যাস ধাঁচেরই একটা বই এটা মনমোহন বইয়ের আগাম মুসাবিদাটি হাতে পেয়েই তলিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্য চাপা দেওয়া যাবে না।

তবে হ্যাঁ, আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না মনমোহন নিজে একটি আত্মজীবনী লিখছেন। সেখানে নজর আন্দাজ করা যাবে তিনি কি চোখে তাঁর নেতৃত্বের ইউপিএ সরকারকে দেখেছেন। তবে সে অপেক্ষা ঈশ্বর দর্শনের মতো কিছু রেকর্ড তাঁর নেই। এই অবস্থায় মনমোহনের আত্মজীবনী প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিন্তু বারুর বইটিকেই ইউপিএ জমানার কাজকর্মের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বই বলেই ধরব। কেননা এটি এমন একজন লিখেছেন যিনি সরকারের মধ্যে একমাত্র মনমোহন অনুরাগী বা সমর্থক বা পন্থী যাই বলুন না কেন তাই ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ছবি

বইটিতে যে প্রধানমন্ত্রী খুব একটা ঝকঝকে ভাবমূর্তিতে দেখা দেবেন এমনটা কেউই ভাবেনি। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি একজন একটু চাপ দিলেই নুয়ে পড়া, ব্যক্তিত্বশূন্য কেবল রাজনৈতিক মেরুদণ্ড-হীনই নয়, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতাহীন প্রধানমন্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সম্ভবত একবারই আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রনেতার ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন। আচ্ছা, এই পরিস্থিতি

কি দেশবাসীর অজানা যে তাদের প্রধানমন্ত্রী রবার স্ট্যাম্প হয়ে পড়েছেন? এ খবর কি ভারতবাসীর কাছে ছিল না? অবশ্যই ছিল, তাই বারু তাঁর বইয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই সব নেতিবাচক গুণের সম্বন্ধে নতুন আর কি আলোকপাত করতে পারতেন। না, বারু তুলে ধরেছেন সেই সকলেরই মোটামুটি ঠারেঠোরে আন্দাজ করা নিষ্ঠুর সত্যটি। মনমোহন ছিলেন সোনিয়ার হাতের মেরুদণ্ডহীন ক্রীড়নক। একেবারে হ্যান্ড শেকিং দূরত্বের অন্দরমহলে থেকে বারু দেশবাসীকে তাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্জীব অসহায়তার সত্য বিবরণী তুলে দিয়েছেন। বইটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে সোনিয়ার করালগ্রাস— যতই খুঁটিনাটি বিষয়ে মনমোহনকে তা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে ততই তিনি এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় পদসর্বস্ব প্রতিবাদহীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছেন।

এই উন্মোচনে মনমোহন যতটা না কলঙ্কিত হয়েছেন তার থেকে বহুগুণ নীচতায় ভরে গেছে কংগ্রেস সভানেত্রীর রাজনৈতিক চরিত্র। যিনি বছরের পর বছর ধরে 'অন্তরাত্মা' থেকে নিঃস্বার্থ দেশ সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার দাবি করে দেশবাসীর প্রশংসা আদায়ের কপটতা করেছেন, বারুর বই-এর বিষয়বস্তু তাঁর সেই চরম মিথ্যার আচরণ নির্মমভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তিনি যে দশ বছর ধরে দেশবাসীকে নিঃস্বার্থ সেবিকা সেজে ধোঁকা দিয়েছেন তা বারু দিনের আলোর মতো প্রকাশ্যে এনেছেন। বারুর বই কিছু না করুক এটা প্রমাণ করেছে সোনিয়া হচ্ছেন এক কুচক্রী, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ যিনি মহাত্মার ছদ্মবেশ ধরে প্রত্যেকটি নীতি নির্ধারণ থেকে আমলা বদলির সিদ্ধান্তে নিজের মর্জিমাফিক নাক গলিয়েছেন। তাই মনমোহনকে শুধু সিল মোহর প্রধানমন্ত্রী বললেও পরিস্থিতির ভয়ঙ্করতার সঠিক আন্দাজ দেওয়া যাবে না। সেই অর্থে মনমোহন ছিলেন ৭নং রেসকোর্স রোডের (প্রধানমন্ত্রী নিবাস) সাব-টেনান্ট (ভাড়াটের থেকে ভাড়ায় নেওয়া), কেননা মূল ভাড়াটে সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রিত্বের সব কলকাঠিই ১০ জনপথ থেকে নাড়তেন। প্রধানমন্ত্রী হলে তো সোনিয়া ৭নং রেস কোর্সেই অস্থায়ীভাবে থাকতেন।

ভয়াল উপসংহার

কতকগুলি আতঙ্কিত হওয়ার মতো বিষয় ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর তার করাল ছায়া দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছে। এই বইয়ে সেই ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথমত, 'ভারতের কল্পনা বা ভাবনা' নিয়ে যে বিতর্ক আজকাল নানান মহলে শোরগোল তোলে তাকে তছনছ করে দিয়েছে দেশে দীর্ঘদিন ধরে লালিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠা মন্ত্রীগোষ্ঠী পরিচালিত সরকারের ব্যবস্থা। ইউপিএ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা আজকের পরিভাষায় out source করে দেওয়া হয়েছিল মন্ত্রগুপ্তির শপথ না নেওয়া ও সরকারি সিদ্ধান্তের গোপনীয়তার দায়বদ্ধতাহীন এক মহিলার হাতে। তিনিই যা ঠিক বুঝতেন তাই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। প্রধানমন্ত্রী কেবল বাধ্য নফরের মতো নির্দিষ্ট স্থানে সই করতে বাধ্য হতেন। বকলমে এত বড় দেশের রাজত্ব চালানোর এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই।

দ্বিতীয়ত, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যখন প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকাই ছিল না তাহলে দেশের এই দুরবস্থার জন্য সত্যিই কি তাঁকে দোষী করা যায়? লক্ষ্য করবেন ভোট প্রচারের প্রথম দিকে মোদী প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে তুমুল আক্রমণ শানিয়ে ছিলেন। আদতে তার সবটাই বিফলে গেল। ইউপিএ-র আসল খেলোয়াড় কিন্তু শেষ অবধি নিজেকে ছলনার মোড়কে সফলভাবে লুকিয়ে রেখেছেন। তার এই নিশ্ছিদ্র অন্তরালের ছলনার চরিত্রগুলিই টান মেরে খুলে ফেলেছে বারুর বই। এখনও প্রায় ৩০০ সিটের নির্বাচন বাকি আছে, সত্যিই যাঁরা এই কপটতার পরিবর্তন চান তাঁরা চোখ বুজে এই মহিলা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিশানা করুন। তারাই তো দেশকে স্বেচ্ছায় সর্বনাশের পথে নিয়ে গেছে। বারুর বইয়ের নীতিশিক্ষাটি খুবই প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি কয়লা কেলেঙ্কারি, টু-জি দুর্নীতি, আদর্শ ঘোটালা, হরিয়ানার জমি-জালিয়াতির মতো কেলেঙ্কারির নীরব দর্শক, ভগবান জানেন আরও কত অনাবিষ্কৃত লুটপাটে সহযোগিতা করে লাভবান হয়েছেন। তাকে জবাবদিহি করতে হবে। গান্ধী পরিবারকে আজ কৈফিয়ত দিতেই হবে, কেন তারা ভারতের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিল। এই রাষ্ট্র বনাম গান্ধী পরিবার লড়াইয়ে মনমোহন হবেন বিবাদী পক্ষের তারকা সাক্ষী। সেক্ষেত্রে অবসরের পরে তাঁরও অন্তত কিছুটা আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের সুযোগ থাকতে পারে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

সৌজন্যে : পাইওনিয়ার

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মনমোহনের কোনো বিষদাঁত ছিল না তাই সোনিয়ার তা উপড়ানোর দরকার হয়নি

কাঞ্চন গুপ্ত

মনমোহনের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারুর পুস্তক 'Accidental Prime Minister— The Making and Unmaking of Monmohan Singh'-র ওপর কংগ্রেস সরকারিভাবে যে টিপ্পনী করেছে তা স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছিত। দল বলেছে, "বারু তাঁর সরকারি অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সরকারি দপ্তরের অন্দরে ঢুকে তথ্য সংগ্রহ করে তা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করেছেন"। তাঁদের বক্তব্য হলো, "পুস্তকে বর্ণিত কাহিনী রংমাখানো গল্প"। সরকারিভাবে এই অস্বীকার আসলে তথ্যকে পরোক্ষে স্বীকার করেই নেওয়া। দুর্ভাগ্যবশত এই বক্তব্য কার্যত বারুর পুস্তকের সারবত্তাকে মান্যতা দেয়। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত থাকলেও এক দশকে তাঁর হাতে কোনও দায়িত্ব-ই ন্যস্ত করা হয়নি। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মনে করা হচ্ছে, পুস্তকটি মনমোহনকে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দে আপ্লুত করেছে এবং এই তথ্যের মূলসূত্রের উৎস ৭ রেসকোর্সে নিহিত ছিল না, উল্টে এই তথ্যের মূলসূত্রের উৎসস্থল ছিল ১০ জনপথ।

বারু কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেননি, তিনি শুধু মনমোহনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া বা না হওয়া বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন। মনমোহন কীভাবে প্রধানমন্ত্রিত্বের এক দশক পূর্ণ করলেন তা অবশ্য আম-জনতা জানে। তিনি শুধু তাঁর এই পুস্তকে মনমোহনের বিষয়ে জনতার মনে যে ধারণা রয়েছে তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন মনমোহনের মিডিয়া উপদেষ্টা, ফলে ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর হাঁটা-চলা ছিল। মনমোহন কি তবে ভারতের উদ্ধারকর্তা, নাকি সোনিয়ার হাতে বন্দী কোনো মনুষ্যেতর পশু? আসলে পুস্তকে

মনমোহনকে বর্ণিত অবস্থান যথার্থ। মনমোহনের ভীরুতা তাঁর সিভিল সার্ভিস কর্মীর জন্য যথার্থ যা অনেকেই তাঁকে অপদস্থ করা বলে মনে করতে পারেন। অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করবেন নেহরুর উত্তরাধিকারীদের কাছে মেষ-সুলভ আচরণের জন্য। সর্বপ্রথম তাঁকে দেশের সবচেয়ে দুর্বলতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আখ্যাত করেছিলেন স্বয়ং আদবাণী। তাঁর এই মন্তব্য চাপা পড়ে যায় কংগ্রেসীদের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে। একজন নিষ্কর্মা প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সংসদে তাঁর দল একজন অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী বলে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়।

মনমোহন কিন্তু মানেন না যে, তিনি একজন ক্ষমতাবিহীন। তাঁর রাজত্বকালের উপান্তে এসে অনুভব করছেন যে তাঁর কোনও উত্তরসূরি নেই, কেবল ইতিহাস বইয়ের পাদটীকায় তাঁর ঠাঁই মিলবে। এর জন্য দায়ী তিনি নিজেই। মনে করুন গত বছরের বর্ষাকালীন অধিবেশনে সমগ্র বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর এই ক্ষোভ কেবল এক ভ্রান্ত বা একজন অপরাধী রাজনীতিকের নয় বরং এক অক্ষম মানুষের ক্ষোভ যিনি এতদিন ধরে তাঁর মনিবের হুকুম তালিম করে এসেছেন— তিনি কীভাবে ভাবতে পারেন লোকে তাঁকে সম্মান করবে। যদি তাঁর এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকত তবে তিনি তীব্র উষ্মা প্রকাশ করতেন নেহরু বংশের কর্তৃত্বকারিণী সোনিয়ার বিরুদ্ধে এবং অন্য মানুষের মতো নেহরু-গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বেরিয়ে আসতেন পদ ছেড়ে। উল্টে তিনি সোনিয়ার পদলেহন করে পদাসীন হয়ে দেশের অর্থনীতির কেবল ক্ষতি করলেন না বরং সাউথ ব্লকের বদনাম করে ছাড়লেন যা এতদিন কোনও প্রধানমন্ত্রী এমনকী চন্দ্রশেখর যিনি মাত্র কয়েকমাস ক্ষমতা দখল করেছিলেন তিনিও করেননি।

একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি তাঁর পদমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন, সততার বারোটা বাজিয়েছেন তিনি কীভাবে আশা করতে পারেন বিরোধীরা তাঁকে সম্মান করবেন, মর্যাদা দেবেন। যাঁর অবস্থান তাঁর স্বীয় দলীয় নেতাদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে! একমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন যাঁরা সোনিয়ার তাঁবেদার তাঁদের কাছেই মনমোহনের খানিকটা মর্যাদা রয়েছে, নইলে ব্যক্তিগত ভাবে এঁরাই কংগ্রেসের সমালোচনায় মনমোহনকে রেয়াত করবেন না।

এক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার যে সীমাহীন দুর্নীতির আধার সে বিষয়ে কেউ কেউ তাঁকে 'চোর' বলে অভিহিত করায় মনমোহন গুস্সা জাহির করেছেন। এসব বিষয়ে তাঁর কিছু ভাবাই উচিত নয়, কারণ বিরোধীদের সম্পর্কে তাঁর নেত্রী এবং তাঁর দলীয় সাংসদরা অনেক বেশি খারাপ ও

অভব্য উক্তি ব্যবহার করেছেন।

রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলী সৌজন্য দেখিয়েছেন রাজ্যসভায় কোনও অভব্য আচরণ না করে। তিনি তা করতে পারতেন কারণ দুনিয়ার কোনো সরকারের প্রধান সাংসদ কিনে আস্থা ভোটে জয় হাসিল করে না। কিন্তু একজন প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সোজা-সাপটা প্রশ্ন করতে পারি— কোন গণতন্ত্রে একজন প্রধানমন্ত্রী পিছনের দরজা দিয়ে সাংসদ হন? কোন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি মানুষের রায় না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন? পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সীমাহীন অপকর্ম, দুর্নীতি সহ্য করেন? পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্ব দেন সেই সরকারের যে সরকার দুর্নীতির পর দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, এমনকী যিনি এত অভিযোগের পরেও পদত্যাগ পর্যন্ত করেন না? দুনিয়ায় আরেকটা এমন গণতন্ত্র কি রয়েছে যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নিজে তাঁর রেলমন্ত্রীকে বাঁচাতে তৎপর হন যিনি কিনা উৎকোচের বিনিময়ে রেলের উচ্চপদ বিক্রি করেন? প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর আইনমন্ত্রীকে বলতে পারেন যে, দেশের বৃহত্তম দুর্নীতির তদন্তের ফাইল বদলে দিতে? অন্য কোনও গণতন্ত্রে কি প্রধানমন্ত্রী সংসদকে ধোঁকা দেন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে পররাষ্ট্র নীতির ওপর মিথ্যাচার করে? অন্য কোন গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী কম সত্যকথা বলেন? কোন গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী বেমক্কা বিরোধীদের গালি দেন— বিরোধীরা দেশকে লুট করছে বলে?

হাস্যকর ঘটনা হলো মনমোহন সিংহ বারবার ভারতবাসীকে বলতে চাইছেন যে, বিরোধীরা তাঁকে প্রশ্ন করছেন তাঁর মন্ত্রীদের অপকর্ম নিয়ে এবং এই ছুঁতোয় তাঁরা সংসদ অচল করে দিচ্ছেন বারবার কংগ্রেসের কুকীর্তি ফাঁস করতে এবং তাঁর বিস্ময়কর নীরবতায় নিবেশকারীদের আস্থা চলে যাচ্ছে দেশে ও বিদেশে। পুঁজি নিবেশকরা এর আগে আস্থা হারায়নি— সেই দেশ, সেই মানুষ তবুও তারা তাদের আস্থা হারাচ্ছে ইউপিএ সরকারের ওপর যে সরকারের নেতৃত্বে রয়েছে কংগ্রেস আর তার শীর্ষে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

নিশ্চিতরূপে প্রধানমন্ত্রী ভালই জানেন যে, নিবেশকারীদের এই সরকারের ওপর আস্থা নেই, কারণ সরকারের নেতারা সর্বদাই নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে, পুঁজি নিবেশকারীরা সরকারি ব্যয় বাহুল্যতায় যারপরনাই সন্ত্রস্ত, ভীত। প্রধানমন্ত্রী সচেতন ভাবেই ভুলে গেছেন যে, শিল্পসংস্থাগুলির ওপর পূর্বতন বৎসরগুলি থেকে কর চাপানোর দায় বিরোধীদের নয়। যদি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বাতিল হওয়া টেলিকম লাইসেন্সের জন্য পুঁজি নিবেশকারীরা চলে যায় বা হাতগুটিয়ে ফেলে তবে তার দায় কিন্তু টু-জি স্পেকট্রামের তছরুপের জন্য সংসদ অচল হবার দায় বিরোধীদের ওপর বর্তায় না। কারণ বড়সড় চুরির ঘটনা জানা সত্ত্বেও মনমোহন সিং ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসেছিলেন। সংস্কারের গতি যদি রুদ্ধ হয়ে থাকে তা বিরোধীদের জন্য নয়, তার দায়ও বর্তায় প্রধানমন্ত্রীর নীতিপঙ্গুত্বের জন্য। হয় এর দায় গ্রহণ কর অথবা আমাদের দুর্দশার জন্য কোনও বলির পাঁঠার সন্ধান কর।

কংগ্রেসের সভা-সমাবেশে মনমোহনের নাম উচ্চারণ না করাই বিধেয় হবে এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় দল এই গ্রীষ্মের নির্বাচনে ভরাডুবির দায় তাঁর ঘাড়েই চাপাবে। সত্য কথা হলো এর দায় সামগ্রিকভাবে ১০ জনপথ রোডের। কিন্তু আমরা ভুলব না যে মনমোহন সিং হলেন সেই ১০ জনপথ রোডের দরজায় একজন প্রহরী।

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,

Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

নেত্রদান মহাদান

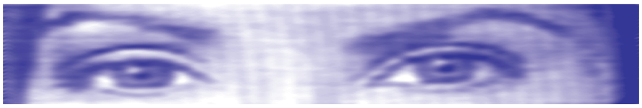

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931

Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

রক্তদান শিবির

গত ১৩ এপ্রিল, রবিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সারদানগর এবং পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এ বছরেও উত্তর কলকাতার বাগবাজারস্থিত লক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট (ময়দাকল)-এ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রেডিওলজিস্ট ডাঃ কমল অসওয়াল, প্রধান অতিথি ছিলেন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন এবং প্রধান বক্তা হিসাবে ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া সম্ভাগ প্রমুখ ভাগচান্দ জৈন। এছাড়া বিশিষ্ট সমাজসেবী রবি বিষ্ণু চোমাল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। গত ২৩ বছর ধরে এই রক্তদান শিবির সফলভাবে আয়োজন করে আসছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সারদা নগর শাখা। সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে রক্তদান শিবিরে নাম নথিভুক্তিকরণ শুরু হয়। মোট ১০৫ জন রক্তদাতা নাম নথিভুক্ত করায়। তার মধ্যে ৪১ জন পুরুষ এবং ১৩ জন মহিলা সহ মোট ৯৪ জন রক্তদান করেন। রক্ত আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী তথা বাগবাজারস্থিত হাটখোলা মেডিকেল ব্যাঙ্কের কর্ণধার ডি আশিস শিবির পরিদর্শনে আসেন এবং সমস্ত রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এছাড়া এই শিবিরে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সহ-সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায়, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ জয়ন্ত পাল, মহানগর সহ-কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর দে, মহানগরের শারীরিক প্রমুখ বিভাস মজুমদার। শিবির পরিচালনা করেন সঙ্ঘের সারদানগর কার্যবাহ শুভঙ্কর কুণ্ডু।

বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের অনুষ্ঠান

স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৬ এপ্রিল কলকাতায় সায়েন্স সিটি-তে 'সায়েন্স ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, স্বামী বিবেকানন্দস ভিসন ইন অ্যাকশন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন ও সায়েন্স সিটি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, ইসরো-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপালন মাধবন নায়ার, ইউজিসি প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিদ্যার অগ্রগতি, মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের বিবর্তন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

প্রসাদ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ৯ মার্চ শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব্ কালচার, তাজপুর, হাওড়া-র উদ্যোগে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য, মহান জননেতা ও পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর শততম জন্মবার্ষিকী বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের সূচনা হলো তাঁর পুণ্য আবির্ভাব দিবস ২৫ চৈত্র বুধবার সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সহ এলাকায় তাঁর অনুরাগী তথা গুণমুগ্ধ মানুষের শোভাযাত্রা প্রসাদবাবুর প্রতিকৃতি-সহ গ্রাম পরিক্রমা শেষে প্রসাদতীর্থ সভাগৃহে সমবেত হয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ও প্রসাদ চক্রবর্তীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করে। পরে প্রসাদবাবুর জীবনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অরবিন্দ দাশ, কান্তিরঞ্জন সামন্ত, ফটিক চক্রবর্তী ও কার্তিকচন্দ্র সারিকেত। বক্তারা প্রসাদবাবুকে ড. শ্যামাপ্রসাদের নীতিধর্ম, রাজনীতি ও কর্মধারার যোগ্য উত্তরসূরি ও বিবেকানন্দের যোগ্য ভাবশিষ্য বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আমৃত্যু গ্রামের মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর জীবন— সংগ্রামের প্রতীক; বন্যার বিরুদ্ধে, ক্ষুধার বিরুদ্ধে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত থেকে তিনি সকলের 'বাবু' অর্থাৎ অভিভাবক অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।

বিকাল ৩টায় প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্যুইজ, আবৃত্তি, নৃত্য গীত পরিবেশিত হয়। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

চা-চক্রে ক্রীড়াবিদরা

সম্প্রতি পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কল্যাণ ভবনে ক্রীড়াভারতীর রাষ্ট্রীয় মহাসচিব রাজ চৌধরি এক চা চক্রের নিমিত্ত আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে। বি ও এ বা রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক কমলেশ চ্যাটার্জি, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন জাতীয় কবাডি অধিনায়ক বিশ্বজিৎ পালিত, যোগ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষক উজ্জ্বল ঘোষ, বিষ্ণু

বিশ্বাস, বিখ্যাত প্রাক্তন ভলিবলার চঞ্চল ব্যানার্জিরা রাজ চৌধরি তথা ক্রীড়াভারতীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কল্যাণ ভবনে এসেছিলেন। পারস্পরিক আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে দু-তরফই হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। যেহেতু ক্রীড়াভারতীর 'মোটো' সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা। যা অলিম্পিক আদর্শেরও প্রতিকল্প, তাই রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়ার রাজ্য সংস্থা ক্রীড়াভারতীর প্রতিটি কাজে সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ইতিমধ্যে। আলোচনাচক্রে রাজ চৌধরি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি তপনমোহন চক্রবর্তী, সংযোজক মধুময় নাথ, সংগঠক বিভাস মজুমদার প্রমুখ। তপন চক্রবর্তী ও রাজ চৌধরি ক্রীড়াভারতীর প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরে বিবিধ কর্মসূচির সুপরিকল্পিত রূপায়ণের কথা তুলে ধরেন। যা শুনে কমলেশ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা সাধুবাদ জানান ক্রীড়াভারতীকে। মূলত ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত ক্রীড়া সংস্কৃতি বিশেষ করে যোগাসন, মার্শাল আর্ট, কবাডি, খো খো খেলাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন তাঁরা।

যোগাসন প্রতিযোগিতা

বীরভূমের রামপুরহাটে ৫, ৬ এপ্রিল ক্রীড়াভারতীর বীরভূম শাখা এক আন্তঃরাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে প্রায় ৮৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন অবশ্য কোনো প্রতিযোগিতা হয়নি। এদিন ছিল বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও যোগশৈলী প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বীরভূম শাখার সভাপতি শুভেন্দু কর ও মহারাষ্ট্রের মুখ্য প্রশিক্ষক উদয় জনার্দন কাহালেকর। এরপর তিন যোগাসনবিদ সূর্যনমস্কার ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। বিকেলে বিবিধ যোগশৈলী প্রদর্শন করে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা। সেমিনারে অংশ নেন বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষক তথা বিচারক উজ্জ্বল ঘোষ, ও তার সহযোগী বিচারকরা। পরে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

দ্বিতীয় দিন হয় মূল প্রতিযোগিতা। পাঁচটি বিভাগে ছেলে-মেয়েদের পৃথক প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীরা হলেন সুমন্ত ভৌমিক, তিথি সরকার, রোহিত সেন, সৈমন্তী মল্লিক, অমিত কেশ, অঞ্জলি চৌধুরী, মিঠুন মণ্ডল, শম্পা দলুই, জয়ন্ত দাস, সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য। এই দশজনকে নিয়ে হয় সেরার সেরা বা 'চাম্পিয়ন অব চাম্পিয়নস প্রতিযোগিতা। দুই বিভাগে সেরা হয়েছেন সুমন্ত ভৌমিক ও অঞ্জলি চৌধুরী।

সবশেষে হয় ১০ প্রতিবন্ধীর যোগ প্রদর্শন। এদের মধ্যে ছিলেন দেশের অন্যতম সেরা প্রতিবন্ধী যোগাসনবিদ শান্তনু অধিকারী। শান্তনু বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দেশের জন্য পদক জিতে নিয়ে এসেছেন। এদিন মুখ্য অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াভারতীর প্রাদেশিক সহাধ্যক্ষ প্রাক্তন অলিম্পিয়ান শুটার ভগীরথ সামুই। তার সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অমরেন্দ্র উপাধ্যায়, প্রাদেশিক মুখ্য সংযোজক মধুময় নাথ, সহ-সম্পাদক জয়ন্তী সরকার, বিচারক উজ্জ্বল ঘোষ, মহামায়া রায়, সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ তুহিন শুভ্র ব্যানার্জি প্রমুখ।

এই দুই বিচারক ছাড়া বিষ্ণু বিশ্বাস, নিবেদিতা ঘোষ সহ ৫ বিচারক প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিচালনা করেন।

শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর নবম স্মরণসভা। মঞ্চে রয়েছেন যুগলকিশোর জৈথলিয়া ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

সংস্কার ভারতীর শিল্পী সম্মেলন

গত ২৩ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক সংলগ্ন শরৎ স্মৃতি ভবনে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তের কলকাতা মহানগর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণার পাঁচটি শাখার সমন্বয়ে ২৩তম আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংস্কার প্রবীণ সদস্য তথা প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কার ভারতীর প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, সম্পাদক সুকুমার সেন ও সাহিত্য পত্রিকার অন্যতম সংস্থাপক সদস্য শ্রী সুভাষ ভট্টাচার্য এবং শাশ্বত'র সম্পাদক দেবাশিস লাহিড়ী নটরাজ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করে সম্মেলনের সূচনা করেন। এরপর সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়।

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি বিশিষ্ট নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী মঞ্চে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি অমিত দের সঞ্চালনায় শেষ হয় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে।

শোকসংবাদ

বর্ধমান জেলার এড়ুয়ার মণ্ডল কার্যবাহ উদয় চৌধুরীর দাদা হীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী গত ১ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। স্ত্রী সহ তাঁর দুই কন্যা বর্তমান।

***

বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামের স্বয়ংসেবক সুকুমার গোস্বামী সম্প্রতি গত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। স্ত্রী-সহ এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

***

নদীয়া জেলার প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ কেশব দাসের পিতৃদেব তারাপদ দাস গত ১২ এপ্রিল রাণাঘাট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। এক পুত্র, এক কন্যা-সহ তাঁর নাতিনাতনি বর্তমান।

***

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সরোজ কুমার ধর গত ৩ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, নাতি-নাতনি সহ বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের রেখে গেছেন।

***

গত ১ এপ্রিল ভোরে সংস্কারভারতী সোনারপুর শাখার সদস্যা তথা বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী চৈতালী মণ্ডল রক্ত-ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। চৈতালী শিশুকাল থেকেই সংস্কারভারতী সোনারপুর শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বামী, এক পুত্র, এক কন্যা, মা-সহ বহু গুণমুগ্ধ অনুগামীদের রেখে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

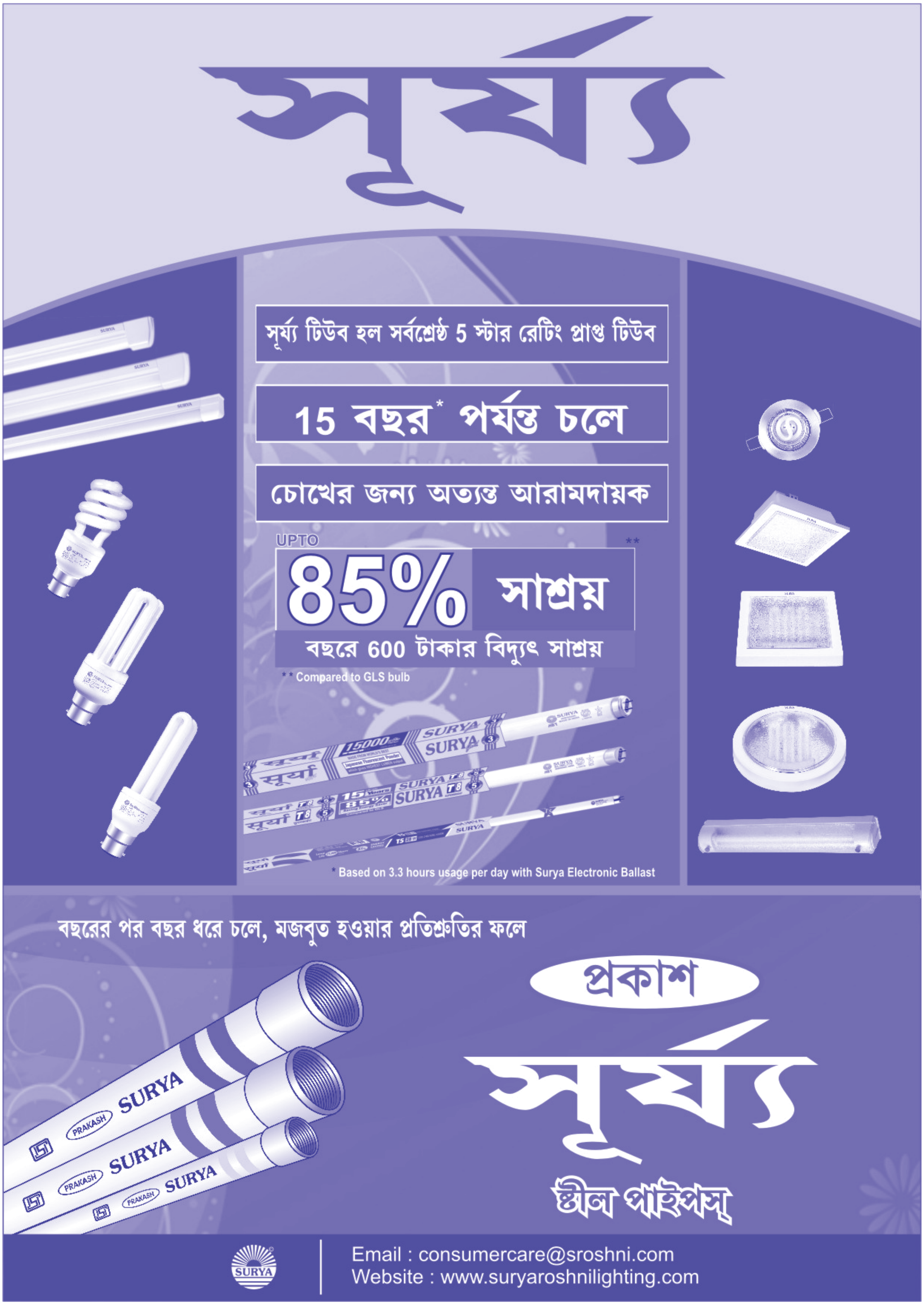

সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয় **
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
28 April - 2014